তিতাস থেকে ত্রিপুরা

বিমল সিংহ

নবচন্দনা প্রকাশনী
রামনগর, রোড নং-২
আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

প্রকাশিকা
সুমিতা সেনগুপ্ত
নবচন্দনা প্রকাশনী
রামনগর, রোড নং—২
আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম)

Book Fair 1987, AGT
Rs. 16.00

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

প্রচ্ছদ : অপরেশ পাল

মূল্য : ষোল টাকা

মুদ্রণে :
গৌরচন্দ্র ভুক্ত
মুদ্রণ ইণ্ডাষ্ট্রীজ (প্রাঃ) লিমিটেড
১৫৪, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

ত্রিপুরা এক ছোট রাজ্য। পাহাড়ে, লুঙ্গায় জাতি উপজাতি মিশ্র জনপদ। কেউ আসে তিতাস পাড়ের গ্রাম ছেড়ে। ছিন্নমূল বহু মানুষের বুকের ব্যথা নিঃশব্দে বাজে এখনো। পাহাড়ে পাহাড়ে ভালোবাসার প্রতিধ্বনি কখনো থমকে দাঁড়ায় কখনো বা পাহাড়ী ছড়ার মতো কলকল বয়। পাহাড়ী মানুষ বুকের দুয়ার খুলে ছিন্নমূলদের হৃদয়ে বসায়। তারই মাঝে কেউ ক্ষত-বিক্ষত ভালোবাসার সওদা নিয়ে ঘোরে ফেরার পথে। তিতাস পাড়ের ছিন্নমূল মাছ বেপারী বেরতী দাস, আর বাদাম ফেরীওয়ালা মনো সাহা আজকে ত্রিপুরার বাসিন্দা। তাদের সহযোগিতার সাথে ত্রিপুরার চেনা অচেনা মৎস্যজীবীদের দরদঢালা সহানুভূতির কাছে চিরঋণী। জাতি উপজাতির মিলন-সেতু দৃঢ় করতে এগিয়ে সাহায্যের হাত বাড়ান সাহিত্যিক ননী কর। জাতি উপজাতির মিলন-ব্যাকুলতা নিয়ে থাকা মানুষের হাতে সঁপে দিচ্ছি "তিতাস থেকে ত্রিপুরা"।

বিমল সিংহ

মাখন পাহাড়ী এলাকার পুরোহিত। পাহাড়ে লুঙ্গায় টিলায় ঘুরে চলেছে অনেক বছর ধরে। সবাই তাকে লম্বাঠাকুর বলে জানে। বাপের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রসুলপুর গ্রামে। বাপের নাম বসন্ত ঠাকুর। রসুলপুর গ্রামটি বর্ষার মরসুমে জলে কলাগাছের ভেলার মতো ভেসে থাকে। চারদিকে গাঙ বিল, বিরাট বিরাট হাওর। এই পাড়া ওই পাড়া, বাজার হাট, যেখানেই হোক নৌকা ছাড়া চলা যায় না। গ্রামের পাশেই তিতাসের মরা নদী। বর্ষা এলে চঞ্চলা বালিকার মতো বুকের ছলছল ঢেউ-এর আঁচল নাচিয়ে তিতাসের সাথে মিলে যেতো। নদী নালা গাঙ বিল জলে জলাকার। মানুষের জীবনধারার কলকলানিও একাকার হতো বিশাল জলরাশির তালে তালে বর্ষায় উজানো মাছের মতো।

জলের মাঝখানে বাড়ীগুলো দ্বীপের মালার মতো জেগে থাকে। বসন্ত-ঠাকুর যাজনিক কাজে নৌকা নিয়ে বেরোয় সে-সব গ্রামে। রসুলপুরে শখানেক হাল্যাদাস তার যজমান। পশ্চিমে তিনটি মুসলমান গ্রাম। নাজিরাবাড়ী, ইসলামপুর, মণিপুর। নাম মণিপুর হলেও কোন মণিপুরী নেই। কবে কোন কালে ছিল জানা নেই কারো। তার পশ্চিমে নমসুদ্র গ্রাম। দত্তখলা। সেখানেও কয়েক বাড়ী শিষ্যসেবক আছে। তিতাসের উত্তর পাড়ে বাকাইল, খলাপাড়া, কুচুনি, বুড্ডা এলাকা জুড়ে বসন্তঠাকুরের যজমানি-সাম্রাজ্য। কেউ হাল্যাদাস, কেউ কৈবর্ত।

উৎসব পার্বণে নানা অনুষ্ঠানে ঠাকুর যেতো নৌকা নিয়ে। কিরায়া নৌকা তখন দৈনিক পাঁচ সিকা থেকে দু'টাকায় পাওয়া যেতো। মাঝিদের অনেকেই

ঠাকুরের শিষ্যসেবক। চেনাজানা। নমস্শূদ্র মাঝিই ছিল বেশী। ঠাকুর না হয় কর্তা সম্বোধন করে প্রণাম জানিয়ে নৌকায় তুলত। কৈবর্ত, নমঃশুদ্রদের আলাদা আলাদা ব্রাহ্মণ ছিল। অনেকেই গ্রাম্য ঝগড়া দলাদলির প্যাচে পড়ে নিজেদের পুরোহিত ছেড়ে বসন্ত ঠাকুরকেই পুরোহিত মেনে নেন।

মাখনের বয়স তখন দশ বছর। বাপের সাথে নৌকা চড়ে বর্তে, শ্রাদ্ধে, বিয়েতে যেতো। কখনো দক্ষিণ দিকে সাডির পাড়া বা বরুন কান্দিতে কপালী গ্রামে। চান্দুয়া বাজার ছিল গমগমে। এখনও সুন্দর কপালীর তেতলা বাড়ী স্বপ্নেদেখা রাজপুরীর মতো আবছা মনে ভাসে। কখনো যেতো কালীসীমা সাতগাঁও। নৌকা বোঝাই করে ফিরে আসতো, চাল, কলা, নারিকেল, গামছা ধুতি নিয়ে।

ইস্কুলে যেতো অনেক দূরে, সাতগাঁও গ্রামের পুবে পসারচান ইস্কুলে। ইস্কুলটা বেসরকারী হলেও বড় কড়া। শশী পণ্ডিতের ভয়ে সারাটা ইস্কুল থরো থরো কাঁপতো। বেতের ঘায়ে পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে যেতো। মুরুব্বী মাতব্বর যারা সমাজের হর্তাকর্তা, তাদের অনেকেই শশী পণ্ডিতের ভয়ে পড়া ছাড়ে। অন্য পড়া যেমন তেমন, শশী পণ্ডিতের পড়া না শিখে উপায় ছিল না।

কিন্তু বায়োস্কোপওয়ালা ডমরু বাজিয়ে যখন গ্রামে আসতো তখন মন টিকতো না। ছুটে যেতো পাশের বাড়ীর উঠোনে বায়োস্কোপের ছবি দেখতে। বায়োস্কোপের ভেতর দিল্লী শহর দেখা যেতো। আরো কত কি। একচোখ বন্ধ করে তাকালে অপরূপ দৃশ্য একের পর এক ভেসে যায়। যে দেখায়, পায়ে তার ঘুঙুর বাঁধা। নেচে নেচে গেয়ে, ছবির কল ঘুরায়। একটার পর একটা ছবি আসে। তার হাতে বাজে একটা ডমরু। ডমরুর তালে তালে সে গান গায়। ছবি একটা আসে, একটা যায়। চাল বা তামার পয়সা দিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দেখে। কোন কোন সময় নতুন বৌরাও আসতো লম্বা ঘোমটা টেনে। সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টিও বেচতো বায়স্কোপওয়ালা। মাখন, হরি, রাধাচরণ যেমন যেতো তেমনি উঠোনে ভিড় করতো মেয়েরা। মাখন আর হরি যখন একচোখ বন্ধ করে তাকায় তখন বায়স্কোপের ফেরিওয়ালা গান গাইত—

দেখ সব নজর করে
কি সুন্দর দেখা গেছে
দিল্লী শহর আয়া পড়ছে
রাজারানী বইস্যা রইছে
কত সুন্দর দেখা গেছে।
আরো দেখ নজর করে
গুনাই বিবি আইস্যা পড়ছে
বিবি কত সুন্দর আছে
দেখরে বাই নজর করে।

সেই সব দৃশ্য স্বপ্নের মতো মনের পটে ভেসে থাকে। তন্ময় হয়ে থাকার সময় সুধন মাল আসে। মাখনকে ডাকে। বলে, ঠাকুর নিজে লিখাপড়া শিখতাছ, দেখনা আমার নাতিডারেনি ইস্কুলে পড়ান যায়। বংশেতো হগলতাই গণ্ডমূর্খ। ইডারেনি মানুষ করা যায়।

সুধন মালের বংশে লেখাপড়া জানা কেউ নেই। রসুলপুরে সুধন দাস নামকরা। গ্রামের তিন ভাগের এক ভাগ তারই বংশাবলী। বড় দুঃখ মনে। কেউ নাম দস্তখত জানে না। নাতিটাকে কোনরকম লেখাপড়া শেখাতে পারলে যেন বংশের একটা মর্যাদা বাড়ে। নাতির নাম হরিচরণ। বয়সে ছোট হলেও মাখনের বন্ধু। মাঠে মাঠে এক সাথে গোল্লাছুট খেলে। উঠোনে উঠোনে হাডুডু। কখনো আমগাছে লাফিয়ে ওঠে, কখনো নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দিন কাটায়।

মাখন ইস্কুলে যায়। অথচ হরিচরণ তারই সঙ্গী হয়ে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকবে। এটা কেমন কথা। সুধন মাল তার নাতিকে ইস্কুলে পাঠালো মাখনের সঙ্গে। মাখনের তখন বড় অহংকার। অভিভাবকের মতো দায়িত্ব। বুঝদারের মতো সে হরিকে বুঝায়, গিয়া কইলাম মাষ্টারবাবুরে প্রণাম করিস। নাম জিজ্ঞাইলে, বাপের নাম জিজ্ঞাইলে ডরাইস না। চটপট উত্তর দিস্।

যথারীতি মাষ্টারের সামনে গিয়ে দুজন হাজির। মাষ্টারবাবু ব্রাহ্মণ। কুলীন বাড়ীর ছেলে। কেমন একটা তাচ্ছিল্য ভরে কথা বলে, গাবরের পুত আর চায়ালের পুতেরা লেখাপড়া শিখলে মাছ ধরব কেডা। বিদ্যা শিক্ষা করতে

হইলে জাত বংশ দেখন লাগে। যারে তারে ইস্কুলে ঢুকাইয়া ইস্কুল নষ্ট করন যাইত না।

লজ্জায় ভয়ে হরিচরণের চোখে জল আসে। মাখনের অহংকারও নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। অপমানে লজ্জায় মাখন হরিকে নিয়ে ইস্কুল থেকে বেরয়।

শশী পণ্ডিত ইত্যবসরে জানতে পারেন হরির পরিচয়। সুধন মালের নাতি। এলাকার বড় জবরদস্ত লাঠিয়াল। রেগে গেলে উপায় নেই। রাগের চোটে আকাম কুকাম করতে পারে। কিছুক্ষণ ভেবে চিন্তে আবার মাখনকে ডাকে।

—সুধন মালের নাতিরে তুই লইয়া আইছস, হেই কথা কছনা ক্যেরে। ঠিক আছে, কালকা থাইক্যা তার নাম ইস্কুলের খাতায় লেখুম।

পরদিন সুধন মাল চান্দুরা বাজার থেকে নাতির জন্য নতুন জামা-কাপড় এনে দেয়। বাড়ীর লোকের আনন্দ আর ধরে না। কৈবর্ত বাড়ী থেকে প্রথম ইস্কুলে যাচ্ছে একটা ছেলে। পাড়ায় পাড়ায় নাতির কীর্তি প্রচার করে বেড়ায় সুধন মাল। ইস্কুলে ভর্তি করানোর কৃতিত্ব মাখনের। মাখন আর হরি দু'জনে মিলে ইস্কুলে যায়। মাখন ওপরের ক্লাসে পড়ে। কখনো সে হরিকে ভাইয়ের মতো পড়ায়। সন্ধ্যাবেলায় কুপি বাতি জ্বালিয়ে হরি যখন পড়ে, দাদু তখন কাছে বসে নাতির পড়া শোনে। ভুল শুদ্ধ বুঝে না। শুধু সুর তুলে নাতির ছড়া পড়া শোনে। বুকের ভেতর অদ্ভুত তৃপ্তি লাগে।

দেখতে দেখতে সরস্বতী পুজো এলো। মাষ্টারবাবু ইস্কুলে বলে দিয়েছে পুজোয় চাঁদা দু' আনা করে আনতে। হরি গেল মায়ের থেকে দু'আনি নিয়ে ইস্কুলে দিতে। হাতের মুঠোর ভেতর থাকতে থাকতে দু' আনিটা বেশ গরম হয়েছে। সব ছাত্র মাষ্টারের কাছে দু'আনা করে জমা রাখে। মাখনও জমা দেয়। কিন্তু হরি যখন জমা দিতে গেল মাষ্টার সে পয়সা রাখলো না। ধমক দিয়ে বললো, তোর পয়সা দিয়া কি করুম। গাবর চাবালের পয়সা রাইখ্যা পূজা করলে দেবীর পূজা করন যাইত না।

মাষ্টারের সঙ্গে তর্ক করার সাহস নেই। যুক্তি খুঁজে পায় না। কৈবর্তের

বুঝি সরস্বতী পুজো করার অধিকার নেই। থাকলে এমন কথা কি মাষ্টার বলতে পারে।

বাড়ী এলো এক বুক অপমান নিয়ে। পুজোর দিন সকাল থেকেই উপোস থাকে অঞ্জলি দেবে বলে। স্নান করে শুদ্ধ হয়ে ইস্কুলে যায়। অঞ্জলি দিতে দেবীর সামনে সবাই দাঁড়ায়। মাষ্টার ফুল, বেলপাতা আমের মুকুল মুঠো মুঠো ছেলেদের হাতে বিলায়। হরিও হাত বাড়ায়। মাষ্টার বলে, তুই পরে নিস্।

সবার অঞ্জলি শেষ। মাষ্টার হরিকে ডেকে বাসিফুল, শুকনো বেলপাতা, ওপর থেকে হরির হাতে ফেলে। পাছে কৈবর্তকে ছুঁয়ে জাত যায়। হরি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে ওঠে। মাখন প্রতিবাদ করে বলে, স্যার পচা মাংস খাওঅইন্যা কাউয়া মন্দিরে বইলে অশৌচ হয় না, মানষের পোলা ফুল ধরলে পূজা নষ্ট হয় কেমনে বুঝি না।

কে শোনে কার কথা। ঢাকের আওয়াজে সব চাপা পড়ে যায়। পরদিন থেকে হরি আর স্কুলে আসে না। মাখন তিক্ত অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে ইস্কুলে এক নতুন অধ্যায় সুরু করে।

এর মধ্যে যাজনিক কাজের শিক্ষা চলে একসাথে।

সন্ধ্যেবাতি জ্বালতেই খড়ম পায়ে দিয়ে পা ধুয়ে বসতে হতো ধর্মগ্রন্থ নিয়ে। খড়ম জোড়া ছিল ভারী কাঁঠাল কাঠের। পায়ের বুড়ো আঙ্গুল আর মেঝো আঙ্গুলের ফাঁকে ব্যথা করত। মাদুর পেতে পুরোহিত দর্পণ পেতে যখন মাখন বসতো বাপ থাকতো জল চৌকিতে। তামাক টানতে টানতে ছেলেকে শিখিয়ে দিতো আচার-অনুষ্ঠানের নিয়ম বিধি। গায়ত্রী মন্ত্র, সূয প্রণাম, চণ্ডীপাঠ থেকে শনির পাঁচালী পযন্ত মুখস্ত করে শোনাতে হতো। কখনো আবার তিতাসের চরে গিয়ে কাশবন এনে বড় নিষ্ঠার সাথে ছেলেকে শেখাতো হস্তকুশ বানানোর কলাকৌশল। আড়াই প্যাচ দিয়ে গিট বাঁধা তখন বড় কঠিন মনে হতো।

কখনো আবার কলাগাছের ছাল দিয়ে ডোঙ্গা বানানো, মঠ বানানো, দুর্গাপূজার মণ্ডপ আঁকা, কুষ্ঠি বিচার, পঞ্জিকার লগ্ন ক্ষণ বিচার করা কোন কিছুই বাদ পড়ত না। কোথাও ভুল হলে বা একটু অন্যমনস্ক হলে বসন্ত ঠাকুর দুর্বাসার মতো গজে উঠতো, বাওনের ঘরে জন্ম লইয়া মন্ত্রতন্ত্র না শিখলে বেটা খাইবি কি কইরা!

শ্রাদ্ধের জায় লিখে দেওয়া বড় কঠিন। যজমানদের মধ্যে কেউ গরীব, কেউ ধনী। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা দেয়া এক দুরূহ ব্যাপার। আঠার পুরাণ চৌদ্দ শাস্ত্রের পাতায় পাতায় কত নিয়ম বিধি, তার চেয়েও দুরূহ লাগতো আভ্যুদিক শ্রাদ্ধ, আদ্যশ্রাদ্ধ, বাৎসরিক শ্রাদ্ধের চুলচেরা নিয়মাবলী। পুষ্প পাত্রের মন্ত্র, পিতৃপুরুষের মন্ত্র, শান্তিজলের মন্ত্র পাঠের মধ্যে কেমন যেন একটা পবিত্র স্নিগ্ধতায় মন জুড়িয়ে যেতো।

মন্ত্র পড়লেই হয় না। নিয়মিত নিষ্ঠার সাথে চর্চার দরকার ছিল। চর্চা করতো হাতে কলমে। শিখতে বেরোত বাপের সাথে গ্রামে গ্রামে। কখনো নৌকায়, কখনো পায়ে হেঁটে। দূর-দূরান্তের গ্রামে যজমানদের বাড়ী বাড়ী। কারো শ্রাদ্ধ, কারো বা বিয়ে। কারো বর্ত। দড়িতে ফাঁস লেগে কারো গরু মরলে প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতো। নতুবা অসুখ বিসুখে জর্জরিত যজমান বাড়ীর পাপ খণ্ডনের মন্ত্র পড়তো। এর মধ্যে ছিল মর্যাদায় ভরা এক সুখ, গৌরবের অনুভূতি।

কোন কোন সময় মুসলমানরাও আসতো। উঠোনের বাইরে থেকে জানান দিতো, কর্তা বাড়িতে আছেন নি ?

বসন্ত ঠাকুর হুঁকো থেকে মুখ সরিয়ে জবাব দিতো, কেডাও, রমজান নি ? আয় ! আয় ! বাড়ীত আয়।

এমন সোহাগ-সম্বোধন কোথায় পাবে। ঠাকুরের জলপড়া ছেলের গায়ে ছিটাবে। ঠাকুরে দোয়া করলে মঙ্গল হবে। এক অদ্ভুত বিশ্বাসের কাছে হিন্দু-মুসলমান কেন জানি নতজানু হয়ে থাকে।

থাকে বলেই মাছ, দুধ, কলা নিয়ে আসতো শিষ্যসেবক যজমানরা। উঠোনে ব্রাহ্মণকে প্রণাম জানিয়ে বসতো। তামাক টানতো। আউশের ক্ষেত কেমন, পাটক্ষেতের ফলন, বা বর্ষাল ধানের ক্ষেতে কাকিয়া মাছ ধরার গল্প বলতো। গল্প নয়, আমেজ করা সুখ-দুঃখ মেশানো নিবিড় কোন রূপকথা। শুনতো সে-সব কাহিনী। আলাদা হুঁকো প্রস্তুত থাকতো শিষ্যদের জন্য। বিভিন্ন জাত অনুযায়ী। কোনটা হাল্যাদাসের, কোনটা কৈবর্তের। কোনটা নমস্বদের।

মুসলমানদের হুঁকো থাকতো না। ছিল কল্কি ছিলিম। এতে তারাও

অপমানকর কিছু ভাবতো না। সহজে সমাজের একটা নিয়ম বলে মেনে নিতো। স্নেহ দরদ মাখা সম্পর্কে এতে কোন সংশয় ছিল না। মুসলমানরা পিঁড়িতে বসে, চলে গেলে জল ছিটিয়ে পিঁড়ি আবার শুদ্ধ করে রাখতেন মাখনের মা।

হিন্দুরাও যেতো মুসলমানদের নানা অনুষ্ঠানে। ইসলামপুরে হোসেন মিঞার নাতনীর সাদীতে, নতুবা বসির চাচার ঘরে জারি গানের আসর। শুনতে যেতো সবাই। মাখনও যেতো বাপের সাথে। মুসলমানরা ঘোষদের থেকে এনে মিষ্টি জলপানের ব্যবস্থা করতো আলাদা জায়গায় হিন্দুর জন্য। তৃপ্তির সাথে খেয়েদেয়ে হিন্দুরা ফিরতো যে যার বাড়ী। কেউ তুলতো ঢেকুর, কেউ ভাটিয়ালী গানের সুর। দূর থেকে দূরে বিলীন হতো মধুময় মিলন ব্যাঞ্জনা। তিতাস পাড়ের গ্রামগুলি যেন নেচে নেচে উঠতো ছলো ছলো আবেগে।

কখনো মাখন গেছে বাকাইল হাল্যাদাসদের গ্রামে বাপের সাথে। গেরস্থ বাড়ী। ব্রাহ্মণের প্রতি ছিল অগাধ সমীহ আর ভালোবাসা। গিয়েই হাত-মুখ ধুয়ে বসে পড়ত জলপান করতে। বোম্বাইয়া গুড়, বড় বড় সবরী কলা, চিড়া, ফুট খৈ, দৈ বিরাট থালায় সাজিয়ে এগিয়ে দিতো। হাপুস হুপুস শব্দে জলপান শেষ হতো তৃপ্তির সাথে। তারপরে স্নান। স্নানের আগে তেল মাখা। বাটি ভরে সরষের তেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো যজমানের ঝি না হয় বৌ। তেলের রঙ যেমন গন্ধও তেমন। দেখলেই ক্ষুধার উদ্রেক করে। পেটে, পিঠে হাতে পায়ে, আঙুলে, নখে, কনুইয়ে মাখতে মাখতে সারা শরীর চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কোন কোন দিন তেলের চমৎকার গন্ধে লোভ সামলাতে পারত না বসন্ত ঠাকুর। খালি তেলই ফুরুৎ ফুরুৎ টান দিয়ে বাটি শেষ করতো। কোন কোন রসিক যজমান ঠাট্টা করে বলতো, ঠিক নি কর্তা। মাইনষে যে কয়, বাউনের তিন আঙুল কপাল বাদ দিলে আস্তা শরীলটাই বুলে পেট। কেউ খলো খলো হাসতো। মাখনের মুখ তখন কেমন যেন লাজিয়ে উঠতো।

লেপেমুছে, জল তুলে, বাসন মেজে ঠাকুরদের রান্নার আয়োজন শুরু হতো। চাল ডাল তেল নুন সবজি দিয়ে সিদে সাজিয়ে দিতো যজমান বাড়ীর

লোক। ব্রাহ্মণ মানুষ, নিজের হাতে রান্না করতে হয়। ঠাকুর যখন রাঁধে, বাড়ীর মেয়েলোকরা দাঁড়িয়ে থাকে পাশে। কি জানি ঠাকুরের কখন কি লাগে। বিভিন্ন ব্যাঞ্জনের গন্ধে বাতাস যখন ভারী হয়ে উঠতো, বিরাট বিরাট পাথরের থালায় ঠাকুর আর ছেলে বসতো খেতে। ঠাকুরদের খাওয়া দেখে যজমানদের জিভে জল আসে। গ্রাসে গ্রাসে থালা শেষ। তারপর মিষ্টি দৈ। বাকাইলের ধনী যজমান উমেশ চৌধুরী খাইয়ে খুশী। ঠাকুরের খাওয়া দেখে বলতেন, কর্তা কোমরের চাবিটা খাড়া অইছে না। আরো কিছু লন। চাবি যদি খাড়া না অয় বাউনের খাওন কি পুরা অয়!

বসন্ত ঠাকুরও কম রসিক না। জবাব দেয় তেমনি, রাখ তোমার বাওন। আমরা কি খাই। ঠাকুর্দারা দুই ভাই মিলা বুলে আস্তা একটা পাঢা খাইতে পারত।

উমেশ হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, এরপর পেট ফুইলা বেরাম ধরছে নি?

—ডাক্তারে দেইখ্যা কইছিল, আরে উমেইশ্যা, ইঢা কি করছস। ঠাকুর্দা বুলে জবাব দিছিল—ডাক্তারবাবু, বড়ি যাইবার জাগা থাকলে তো আরেকটা রসগোল্লা খাইলাম অইলে।

ব্রাহ্মণদের পাতের প্রসাদের অপেক্ষায় থাকতো বাড়ী শুদ্ধ লোক। বুড়ো বুড়ি, ছেলে, বৌ সবাই মিলে অমৃতের মতো সেই উচ্ছিষ্ট প্রসাদ মুখে নিতো। তাতেই কত পুণ্য, কত তৃপ্তি!

গামছায় পোঁটলা বেঁধে চাল ডাল সবজীর সিদে নিয়ে নৌকা করে বাড়ী ফিরতো। ঘরে তখন কত আনন্দ। তিন বেলা খাওয়া। যা পেয়েছে তা দ্রুত শেষ করতে না পারলে যেন বড় যন্ত্রণা। কাজেই নিঃশেষ করে খাও। এমনি ধারার চরিত্র। যেদিন নেই, সেদিন উপোস। মাখনের মা তখন ছুটতো গ্রামে। দানা খুঁজতে যাওয়া মুরগির মতো। কারো ধান কুটতে, না হয় কারো কাঁথা সেলাই করতে বা কারো ধান সিদ্ধ করতে। যাতে কোনরকম রাতটা কোন কিছু দিয়ে কাটানো যায়। মাও জানত শুধু ভালো রান্না করে খাওয়াতে। সঞ্চয়বোধ একেবারেই ছিল না।

এমনিতে কর্তা কর্তা করে সবাই। ঠাকুরের খড়ম ছুঁয়ে প্রণাম করার

লোকের অভাব নেই। কিন্তু প্রতিদিন ব্রাহ্মণের রাক্ষুসে পেট কে পূরণ করবে।
মাখনের বোন সুখদা উপাস সহ্য করতে পারতো না। খাওয়ার বেলা সীমা থাকত না। কিন্তু কথার বেলায় কৃপণ কৃপণ ভাব দেখাতো। ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে মাকে প্রায়ই বলতো, পাইলে তো তিন দিনেরতা এক দিনে খাই। না পাইলে তো উপাস থাকন লাগে। কুদিনের লাইগ্যা একমুট চাল রাখন যায় না।

বসন্ত ঠাকুর চটে গিয়ে জবাব দেয়, ভ্যান ভ্যান করিস্ না মাইয়্যা। বাওনে আবার জমাইব কি। শিষ্যসেবক যজমানরাই আমরার পোলা মাইয়্যা। হেরারে আশীর্বাদ কব। হেরা বালা থাকলে আমরাঅ বালা থাকুম। বেশী বেশী কইর‍্যা দিব।

তবুও বিশ্বাস। অনুষ্ঠানের রীতিনীতি পালন হলে অভাব বুঝি দূর হবে। দেবদেবীরা খুশী হবেন। দুর্বার আশা নিয়ে বুলাবুলি পুড়তে যায় মাখন। কার্তিকের শেষ দিনে বুলাবুলি। বাড়ীর মেয়েরা তখন দরজা এঁটে ঘরের ভেতর বসে থাকে। মাখনের মা কুলা আর সবুজ ধানের ছড়া সাজিয়ে রাখে দরজায়। মাখন খড় দিয়ে পুতুল বানিয়ে জমির আইলে পুঁতে রাখে। ঘর থেকে একটা করে মশা, মাছি, পিঁপড়ে মেরে সিম পাতার পুটলি বেঁধে খড়ের মুখে রাখে। আগুন জ্বেলে বাড়ীর দিকে দৌড়ায়। পেছন ফিরে তাকানো নিষেধ। কার্তিক মাসের পেত্নীর অশুভ দৃষ্টি পড়তে পারে। এসেই ধানের কুলায় গোছা দিয়ে মারতে মারতে সারা বাড়ী সাত পাক ঘুরে।—বালা আইয়ে বুড়া যায়। কার্তিক মাইস্যা পেরেত যায়। টেকা পয়সায় ঘর ভর। ধান চাইলে গোলা ভর।

ধানের ছড়াটি এনে ঘরের মথনি পালায় বেঁধে বাখে।

তবুও ব্রাহ্মণ ঘরের অভাব দূর হয় না। বিকট কোন ডাইনীর মত অভাব গোটা বাড়ীটাকে গিলতে আসে।

বাড়ীর অভাব যখন রাক্ষুসে বাতাসের মতো হু হু করে ঢোকে পড়াশুনায় বসে না মন। সংস্কৃতের মন্ত্রগুলো নীরস কুড়ালের আঘাতের মতো মনে লাগে। ভালো লাগে না কোন কিছুই। রীতিমত খাওয়া যখন দিতে পারে না বাপের শাসন করার দোর্দণ্ড প্রতাপটাও যেন কেমন নিস্তেজ।—পড়াশুনা কর। বাওনের

পুত অইয়্যা মূর্খ থাকলে মাইনষে কি কইব। এই জাতীয় কথা তখন মূল্যহীন প্রলাপের মতো মনে হতো মাখনের কাছে।

যজমানের ছেলে হাছনী নমসুদ না হয় নন্দ দাসের সাথে ছুটে যেতো তিতাসের পাড়ে। মরা গাঙের কিনারে কিনারে। কচ্ছপ, কাছিমের ডিম খুঁজতে। তিতাসের বিস্তীর্ণ চরে কাশবনের কাছে কাছে এঁটেল মাটি বা বালু খুঁড়ে গর্ত করতো কচ্ছপ। গর্তের মধ্যে ডিম ছেড়ে বালু দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতো। তখন আশ্বিন কার্তিক মাস। নদীর জল কমতে থাকে। পাড় ভাঙার ভয় থাকে না। জলে ডুবিয়ে পলিমাটির আস্তরণ জমে না। তখনই কচ্ছপ ডিম পাড়ে। গর্তের মুখে মাটি চাপা দিয়ে কাছিম চলে যায়। কখনো গর্তের ওপর নখের আঁচড়ের দাগ থাকে। কখনো আবার বৃষ্টিতে ধুয়ে নিয়ে যায়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয়। তার আগেই মাখন ছুটতো ডিম খুঁজতে। ভোরের দিকে তিন বন্ধু মিলে জলের কিনারে কিনারে হাটত। যেতে যেতে কখনো পেয়ে যেতো কচ্ছপের গর্ত। খুঁড়ে খুঁড়ে বের করতো এক একটা গর্ত থেকে বিশ পঁচিশটা ডিম। মাখনের উপোসী মুখটা কেমন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠতো অদ্ভুত খুশীতে। নন্দ জিজ্ঞেস করতো, ডিম পাইছনি ঠাকুরবাই। মাখন তখন জবাব দিত, ডিম না বেডা সোনার খনি পাইছি।

বাড়ী এসে দেখে বুড়ো ব্রাহ্মণের মেজাজ চড়া। গামছাবাঁধা ডিমের পোঁটলা খুলতেই ব্রাহ্মণ খুশী ভরা চোখে তাকাতো। রাগের ছাপ মিলিয়ে গিয়ে খুশীর ঝলক ছড়িয়ে পড়তো মুখে। ছেলেকে শাসন করার নৈতিকতা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়তো। আদরমাখা গলায় বৌকে বলতো, হুনছনি, পোলাডা রাইতঅ কিছু খাইছে না। কডা ডিমের বড়া বানাই দেওচাইন।

কখনো ছুটত ভাদ্রের বাদলঝরা রাতে ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে। বৈশাখে বোনা বর্ষাল ধান জল বাড়ার সাথে সাথে বেড়ে ওঠে। দশ হাত জল গভীর হলে ধান গাছও বাড়ে দশ হাত। ধান গাছের ফাঁকে বা সাপলা ফুলের ফাঁকে ফাঁকে এক ঠোঁটের সুবল মাছের ঝাঁক ছুটে বেড়ায়। কেউ বলে কাকিয়া মাছ। নৌকায় মশাল দেখে দিশেহারা হয়ে মাছের ঝাঁক আসতো নৌকার পাশে। কুশা দিয়ে বিঁধে বিঁধে নৌকা ভরা শুরু হতো। রূপালী মাছের

চেহারায় কেমন মোহময় রূপ ছিল কে জানে! ঠাকুর বালক পেটের ক্ষুধা ভুলে যেতো। কখন ভোর হয়ে আসতো টেরই পেতো না।

রাতে পেটে দানা যখন পড়ে না ঘুম আসে না। ভোর হলেই ছুটে বিলের পাড়ে পাড়ে।

রসুলপুরের চারদিক ঘিরে বিরাট বিরাট বিল। বর্ষায় জলে পাড়ের কোন সীমা থাকে না। কার্তিক অঘ্রানে পাড়ের জল শুকিয়ে জমি বেরোয়। তিতাস নদী কতদিন ধরে বহমান কেউ জানে না। যুগে যুগে তিতাস গতিপথ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সরে সরে দৌড়ে। ফেলে যাওয়া পথ তখন বিশাল জলাশয় হয়ে থাকে। সেই মরা গাঙে মাছ জমে। পাড়ে পাড়ে দূরে দূরে ইজল গাছ, জারুল গাছ, আর করম গাছ। গাছের ডালে মাছরাঙা, বক বাসা বাঁধে। জলের কিনারা ছুঁয়ে ছুঁয়ে ছনবন আর বল্লুয়া লতার দোলা। ফাঁকে ফাঁকে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে তন্ময় হয়ে বকের ঝাঁক। অথৈ জলের মাঝে ভেসে ভেসে বেড়ায় বালিহাঁসের দল। কোথাও পানকৌড়ি ঝিনুক শামুক খুঁজে খুঁজে ডুব দেয়। আবার উড়তে উড়তে ডানে বাঁয়ে গলা বাড়িয়ে সঙ্গিনীকে কি যেন ইশারা জানায়। কখনো বা ফরালী কচুরীপানার ঝোপে ঝোপে ডানা ঝাপটে বড় নিচু হয়ে বাঁশের খড়ম পায়ে দিয়ে চলা কিশোরী বালিকার মতো পা তুলে তুলে ছোটে।

তখন কার্তিক মাস। সন্ধ্যেবেলায় মাখনের সঙ্গী রমানাথ দাস, নন্দ দাস। পাখীর ফাই পাতে। তখন অনেক দূরে কৈবর্ত বউয়েরা তৈ তৈ তৈ ডাক দিয়ে ঝিল থেকে পালা হাঁস ডেকে আনে। দূরে দূরে মেঠো পথ ধরে ঘরেফেরা গরুর পালের পিছু পিছু রাখালেরা বাঁশী বাজিয়ে গান গায়। কেউ বা তখন নৌকা নিয়ে মাল বোঝাই করে বাড়ী ফেরে। কেউবা তখন জাল ফেলতে নৌকা নিয়ে তিতাসের দিকে যায়। কৈবর্ত পাড়ায় উলুধ্বনি দিয়ে সন্ধ্যের ধূপদীপ জ্বালায় কোন বালিকা বৌ।

তখনই পাখি ধরার জাল পাতে জলের ওপর। তিনশ চারশ খোপ। উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক দিশেহারা হয়ে ঝাপ দেয় জলের ওপর। ঝোপে আটকায়, গলায় ফাঁস লাগে। পাখা যত নাড়ে গলায় ফাঁস ততো বেশী জড়ায়। ভোরে গিয়ে বড় ডুলা ভরে পাখী ধরে ব্রাহ্মণ কিশোর। কখনো পাড়েই বিক্রি হয়। কখনো

ডুলা ভরে পাখী বেচতে নিয়ে যায় চান্দুয়া চড়ায়। নিজে পাখী বেচে না; বেচে কৈবর্ত সঙ্গীরা।

সব দিন পাখী মেলে না। তবুও পাখী ধরার পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরত যখন বসন্তের উপোসী মুখটায় অদ্ভুত এক প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়তো।

কখনো কার্তিকের শেষ রাত্রে বুড়ি ডুলা আর পেলইন জাল নিয়ে ছোটে ঝিলের দিকে। বোরো ধানের ক্ষেতের কোণায় জাল খেউ দিতো। শিং, মাগুর, লাটি উঠতো। ফুটকি বনে কচুরী পানার ঝোপে থাকত জিয়ল কৈ খইলসা মাছ।

ওই মাছ বিক্রি করাতো বন্ধুদের দিয়ে। খেজুর-গুড় খেতে খেতে বাড়ী ফিরতো একসের চাল নিয়ে।

এত অভাব। তার মধ্যেও আবার আত্মীয় কুটুম যায় আসে। কেউ যায় নায়র। রসুলপুর থেকে পত্তন গ্রাম মাইল সাতেক দূর। মাঝখানে বিরাট একটা হাওর। পত্তন গ্রামে মাখনের বোন যশোদার বাড়ী। একদিন যশোদা এলো বাপের বাড়ী। এলেই দেখে বাপের বাড়ীর অবস্থা কাহিল। বাড়ী জুড়ে এক মুঠো চাল নেই। ভাঙ্গাটুটা খরের ছানি। কাকে ঠোকরানো চালার বাঁশ পাঁজরের মতো বেরিয়েছে। ঝকঝকে বাড়ীটার এখন লক্ষ্মীছাড়া ভাব। সন্ধ্যে বেলায় বাতি জালবার লোক পর্যন্ত থাকে না। রিক্ত বাতাস শুধু হাহাকার করে ওঠে।

বাড়ীর বড় মেয়ে। আগে নায়র এসে সাধ মতো ভালো মন্দ খেতে পারতো। এখন ভালো মন্দ দূরের কথা পাতে একটা সেদ্ধ শালুক পর্যন্ত জুটে না। যে বসন্ত ঠাকুরের চোখ দিয়ে ব্রহ্ম তেজ ঠিকরে পড়তো সেই ঠাকুরের চোখের কোলে ঘন ঘন উপাসের কালো ছায়া।

মায়ের অবস্থা আরও করুণ। গায়ে একটা লাল পাড়ের ধূসর শাড়ী। স্নান করতে গিয়ে ভিজালে বদলাবার উপায় নেই। একটা অংশ গায়ে জড়িয়ে আরেক অংশ বাতাসে মেলে ধরে শুকায়। যশোদা আগে এলে আব্দার অভিমান করতো, ফরমায়েস মতো কিছু না পেলে। এখন আব্দার থাক, একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। নায়র এলে বাপ যেতো চান্দুয়া বাজারে। নিজের হাতে বড় চিতল মাছ, ছিটের শাড়ী, পছন্দ মত তেল সাবান চুড়ি,

জামাইয়ের ধুতি নিয়ে আসতো। তাতেও কখনো কখনো যশোদার চোখ ভরতো না। নায়র থেকে ফেরার পথে তিলবাজাল চালের পিঠা, খেজুর গুড়ের চাকা, দৈ, মিষ্টি বেঁধে দিত বেহান বাড়ীর জন্য। এখন অবশ্য মায়ের জন্য কাপড়, মাখনের জন্য জামা, কিছু চাল ডাল নিয়ে নায়র আসে যশোদা।

নায়র আসা এখন এক বিড়ম্বনা। বাপের অসহায় কষ্ট দেখে নিজেরই অস্বস্তি লাগে। বাপও ভাবে নিজের মেয়ে হলেও এখন পরের বাড়ীর বৌ। তাকে উপাসে রেখে কষ্ট দিতে মন মানে না। তাছাড়া নিজের অভাবের কথা জামাই বাড়ীর লোকেরা জেনে গেলে মর্যাদার হানি হবে। কোনরকম মেয়েকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। দুদিন যেতে না যেতেই মাখন আনলো একটা কিরায়া নৌকা। মাঝি ঘাটে নৌকা বেঁধে ঠাকুর বাড়ী তামাক খেতে আসে। যশোদা বুঝে মাঝিটা যে নমস্থদ। হাটুর উপর ধুতি, কাঁধে গামছা গায়ে গেঞ্জি, মাথায় বাঁশের ছাতা। নাকের নীচে বিরাট গোঁফ। নৌকা বাঁধার সময় ধুতিটা মাথায় বাঁধে। সঙ্গে বাঁশের চোঙা। চোঙার গিটের একপাশে তামাক, অন্য দিকে টিক্‌কা। পদ্ম ফুল আঁকা টিনের বাক্সে কাপড় চোপড় ভরে যশোদা ফিরে যাওয়ার আয়োজন করে। বসন্ত ঠাকুর উঠোনে জল চৌকিতে বসে তামাক টানে। অসহায় মানুষ। কর্তব্য পালন করার মতো কোন ক্ষমতা নেই। এমন একটা ভাব। দুঃখে চোখ ছলছল। মেয়েটাকে একবেলা পেটভরে খাওয়াতে পারে নি। মাখন রওয়ানা হলো দিদিকে শ্বশুর-বাড়ী পৌছে দিতে।

প্রতিবেশী গুরুজনদের আর বাপের পায়ে মাথা ঠুকে ঘোমটায় চোখ মুছে মুছে ঘাটের দিকে নামে। মাখনের মা ছুটে গিয়ে যশোদার কনিষ্ঠা আঙ্গুলে কামড় দিয়ে থুথু ছিটায়, মঙ্গল কামনায় ব্যাকুলতা নিয়ে। তিন কোশ জল ছিটিয়ে প্রণাম করে নৌকায় ওঠে যশোদা। আলতামাখা পা দুটো ধীরে ধীরে এগোয় নৌকার ছইয়ার ভেতরে। গৃহলক্ষ্মীযেন দেশান্তরী হচ্ছে বেদনা ভরা বুকে ধীর পদক্ষেপে। ছইয়া মানে নৌকার গোলাকার কোঠা। ছইয়ার সামনের দরজায় নীল রঙের ময়ূরপঙ্খী আঁকা। মাঝির দিকে শাড়ী জড়িয়ে পর্দা টাঙানো। মাঝির মুখ দেখা যায়। মাঝি কিন্তু দেখে না। যশোদা ঘোমটায় মুখ ঢেকে পাটাতনে বসে। বাইরে গলুইয়ে বসে মাখন। ময়ূরপঙ্খী নায়রী

নৌকা বদর বদর এগোয়। অচিন গাঙের মাঝ দরিয়ায় মাঝি তখন ঘরের কথা ভাবে। অমন ঘোমটা টানা কলা-বউ তারই পথ চেয়ে গাঙের পাড়ে বসে আছে। ভাবে বলেই নীল দরিয়ায় বিরহ ভরা ভাটিয়ালী গান গায়। ঝিরি ঝিরি বাতাসে পাল ওড়ে শোঁ শোঁ। ঘাটে মেয়েরা কাপড় কাচে। কেউ বাসন মাজে। সব থামিয়ে শাড়ীর পর্দা টাঙানো নায়রী নৌকার দিকে চায়। বাপের বাড়ীর টানের এক ব্যাকুলতা তাদের বুকেও উথাল পাথাল ঢেউ তুলে।

মাঘ ফাল্গুনে খাল বিল শুকায়। বিল ভরে থাকে সিংরা লতায়। শ্যাওলা জমে সিংরা লতায় জট পাকিয়ে। কিশোর বালক বালিকারা বালিহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে সিংরা পাড়তে বিলের জলে ঝাপাঝাপি দাপাদাপি শুরু করে। মাখন ঠাকুরও যায় সিংরা পাড়তে। দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে খুদ কুড়া থাকে না যখন শালুক সেদ্ধ করে এক আধ বেলা কাটানো যায়। জলে যখন সবাই নামে। কেউ ডুবে, কেউ সাঁতার কাটে, কেউ চীৎকার করে মহা উল্লাসে। শালুক খুঁজে। কেউ তুলে গাঙ কলা। অনেক মেয়ের মতো নন্দর বোন সুমিত্রাও যায় কলস নিয়ে। কলস উপুর করে বুকের নিচে রেখে কৈবর্ত বালিকা সুমিত্রার কি উদ্দামতা। মৎস্যগন্ধা কন্যা যেন জলকেলী করে। মাখন ঠাকুরকে কেমন যেন আত্মভোলা করে তুলতো। ঢেউ-এর দোলায় যৌবন দোলে। খলো খলো হাসে। কখনো জলের ঝাপটা দিয়ে ঠাকুরের মুখে ছিটায়। ভেজা শরীর আঁচলে জড়ানো দেহের ভাঁজে ভাঁজে জাগে বাঁধনহারা রক্তের ছলকানি। লজ্জা সরম ছেড়ে ঠাকুরের কাঁধে হাত রেখে ভাসতে ভাসতে চলে। বাওনের পুত! দেস না কয়ডা সিংরা তুইল্যা। গুড়ি বানাইয়া তোরেও পিঠা খাওয়ামু। সুমিত্রার কণ্ঠলগ্ন হাত তাকে অবশ করে তুলে। নিরাবরণ দেহের পরশে জাগে শিহরণ। পানকৌড়ির মতো জলে ডুবে সিংরা খুঁজে। সিংরা কাঁটার আঁচড় লাগে গায়। তবু মধুময় উপদ্রবের ছোঁয়ায় বুকের গহীনে কেন জানি উথালি পাথালি করে। না বলতে পারে না। কলের পুতুলের মতো সিংরা পাড়তে থাকে।

আসতে যেতে মাখন ঠাকুর নন্দর ঘরে যায়। সুমিত্রা বাসন মাজার ভান করে ঘন ঘন দেখা দেয়। ডাগর কালো চোখ ভরে থমকে থাকে কেমন ধরনের

তন্ময়তা। মাখন ঠাকুরকে নিয়ে পাড়ার মেয়েরা নানারকম রটনা রটায়। কেউ বলে সুমিত্রার হাতের যতো কাঁচের চুড়ি মাখনেরই দেওয়া। কেউ বলে পেটুক ব্রাহ্মণ, পেটের দায়ে জাত মারতে বসেছে। কেউ বলে পিরিতি আঠা জাত বিচার করে না। লাগলে আর ছাড়ে না।

বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। তিতাস পাড়েও পিঠা ভাজে নমসুদ্র কৈবর্ত বৌরা। গন্ধে চারদিক ম ম করে। একদিকে আউস ধান কাটে। কেউ ধান মাড়াই করে। কেউ আবার ধান শুকিয়ে গোলায় তুলে। একই মরশুমে আবার হালও চালায়, আমনের বীজ বুনে। আইল বাঁধে। ধান রোয়া দেয় কেউ। মেয়েরা দক্ষিণা বাতাসের মুখে কুলা থেকে ধান ছাড়ে। বাতাসে উড়ায় ধানের চিটা, তুষা ধান। যখন বাতাস থাকে না ডালা দিয়ে ধান ছড়িয়ে দিয়ে, ঘুরে ঘুরে কুলা দিয়ে বাতাস করে ধান পরিষ্কার করে। গেরস্থের ঘরের ব্যস্ত মাস। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি চলে নারী-পুরুষের। শক্ত সামর্থ্য শরীরগুলো বিশ্রামকাতর হয়ে ওঠে। উঠোনে যখন ধান শুকায়, হঠাৎ বৃষ্টি আসে। হৈ হৈ করে শিশু বুড়ো নারী পুরুষ সবাই মিলে ধান জড়ো করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

তখন ভাদ্রের শেষ দিন, শুরু হয় বর্ত। কারো বাড়ীতে সিদ্ধেশ্বরী বর্ত, কারো বাড়ী কানখাই ঠাকুরের বর্ত। কারো বাড়ী বুড়া-বুড়ি বর্ত। সিদ্ধেশ্বরী বর্ত করলে যার যেমন ইচ্ছা পূরণ হয়। ধনে জনে পূর্ণ হয়। কানখাই ঠাকুরের বর্ত করলে কান পচা লাগে না। কুষ্ঠ হয় না কারো। যাবতীয় চর্মরোগ রোধ করে। বুড়াবুড়ি বর্ত করে আরাধনা করলে শিশুরা দীর্ঘ আয়ু পাবে বুড়োবুড়িদের সঙ্গে।

সোনাধনের বাড়ী জুড়ে গমগম। মেরা পিঠা, পাটি পিঠা, পুলি পিঠা তালের পিঠা বানানোর আয়োজন। সোনাধনের বৌ আর মেয়ে সুমিত্রা দুজনে দুই উঠোনে সিঁদুর দিয়ে বুড়োবুড়ির মূর্তি আঁকে। মাস কলাই, মুগ সরিষা, বুট, মটর, তিল, আমন ধান, সিমের বীচি আট ধরনের বীজ অঙ্কুরিত করে মূর্তির চারদিক ঘিরে সাজিয়ে রাখে। নন্দর মা তখন পরস্তাব বলে। সুমিত্রা তখন চুপি চুপি ভালো ভালো পিঠা লুকিয়ে গামছায় বেঁধে রাখে ধানের ডুলায়।

সন্ধ্যেবেলা যখন মাখন ঠাকুর ভাটিয়ালী গান গেয়ে গ্রাম থেকে বাড়ীর দিকে

ফিরে, রাস্তার পাশে জাম্বুরা গাছের তলায় সুমিত্রা অন্ধকারে পিঠের পুটলি নিয়ে অপেক্ষা করে। ব্রাহ্মণ ছেলে। প্রকাশ্য ঘরে ডেকে খাওয়ালে জাত যাবে। তা ছাড়া মাখনও ইতস্তত করবে। মাখন যখন কাছে আসে, ঝোপের আড়াল থেকে বেরোয় সুমিত্রা। চাপা গলায় বলে, বাওনের পুত, ছোট-জাতের হাতের রান্না তো কোনদিন খাইছ না। খাইয়্যা দেখ কেমন লাগে।

মাখন প্রথমে হতচকিত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝে মুচকি হেসে বলে, তোমার হাতের তিতা পিঠাও তো মিঠা লাগব।

ধান কুটতে গিয়ে নন্দর পিসির সাথে সুমিত্রার ঝগড়া বাঁধে। কথার পিঠে কথা। এক সময় রাগের চোটে মুখ ফসকে খুটা দেয় সুমিত্রাকে, ছিনাল মাইয়্যা, বাওনের পুতে পিরিত কইরা চুড়ি দিছে হেইডা যেমন মাইনষে জানে না।

সুমিত্রা ফুলে ফুলে এমন একটা ভাব দেখায়, জানে জানুক, বলে বলুক। সব আন্দাজে পল বাওয়ার মতো ব্যাপার। সঠিক করে কেউ দেখেনি কিছু। না দেখলেও বিশ্বাস করে সহজ ভাবে সবাই। সুমিত্রার সেই প্রতিবাদহীন নীরবতা পাড়াপড়শীদের কাছে সন্দেহ ঘনিয়ে তুলে।

মাখন যখন এত কানাঘুষা শুনে লজ্জাও লাগে ভয়ও করে। বিশেষ করে নন্দর বাপ সোনাধন। কি রাগী মানুষ। হাল বাইতে যাওয়ার সময় নন্দর মাকে বলেছিল নাস্তার জন্য সাগর গঞ্জের আলুসেদ্ধ পাঠাতে। দেরী দেখে হাল ছেড়ে বাড়ী এসেই পাজন দিয়ে নন্দের মাকে গরুর মত পিটে, বলে, কথাব এদিক সেদিক অইলে পিঠের চামড়া তুইল্যালামু। ক্যারে পুতেরে দাং আলু পাঠাইলি না।

তখন থেকে সোনাধনকে ভয় করে মাখন। তার উপর এলাকার মোড়ল। কখন জানি কি মনে নিয়ে কি কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে। ভাই ভাতিজা ছেলে মিলে গোটা ত্রিশেক লাঠিয়াল বেরোয় এক ডাকে এক ঘর থেকেই।

অন্যদিকে ছেলেবেলা থেকে নন্দর সাথে খেলতে, দৌড়তে মাছ ধরতে একাত্ম হয়ে ঘুরেছে। সেই স্থলে ওই বাড়ীর লোকেরা কি ভাববে যদি এই শোনে।

মনের দুঃখে নন্দর বাড়ীতে যাওয়া ছেড়ে দিল মাখন। তাতেও কি মন
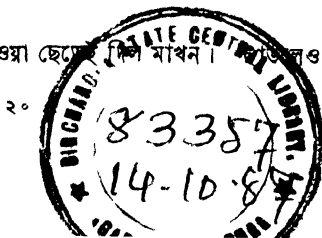
মানে, সুমিত্রার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সুমিত্রাকে ভালোবাসে, ভালো লাগে এমন কথা বলার সাহস নেই। ভুলতে চায় সুমিত্রার মরমী আব্দার গুলো। যত ভুলতে চায় ততবেশী শরীর মন সুমিত্রার দখলে যায়। মাঠে, গাঙে, বিলে শুধু সুমিত্রার ডাগর চোখের চাউনি যেন করুণ হয়ে হাতছানি দেয়। অভাব অনটনের মাঝে মাঝে বুকে তুফান ওঠে অন্য এক অভাবের তাড়নায়।

বর্ষার থৈ থৈ জলে তিতাস মেঘনার গাগট বোয়াল লাটি শোল রুই ঝাঁকে ঝাঁকে ঢোকে বিলে, মরা গাঙে। বাসা বাধে ডিম ছাড়ে। কোথাও কোথাও কচুরীপানা শ্যাওলা ইচাবন জমে দ্বীপ হয়ে মাঝে মাঝে ভাসে।

একটা দুটা বিল নয়। অনেকগুলো বিল। চাতল বিল, রোয়া বিল, বাঘজোড় বিল। বিলের মালিক সরকার। ইজারা রাখে মহাজনরা। শ্যামাবাবু, বাঞ্ছারাম সরকার, বিপিন সরকারের মতো লোকরাই এখানকার বড় মহাজন। সারাটা বছর মরা গাঙে লোক খাটায়। কাটা গাছ, বিশেষ করে জারুলের ডাল, ইজলের ডাল কেটে গাঙে ফেলে। গাছের ডালপালায় শ্যাওলা জমে। শ্যাওলার খেতে মাছ জমে। তখন নৌকা বাওয়া নিষেধ।

সারাটা বছর মাছ আমদানী হয় নদী নালা থেকে বিলগুলির দিকে। পাড়ের জমি ডুবে। মহাজনরা লাঠিয়াল পাঠিয়ে নৌকা দিয়ে বিল পাহারা দেয়। বিলের পাড়ের জমিতেও মাছ ধরতে দেয় না। মাছ ধরা দূরের কথা গরু নামিয়ে স্নান করাতেও দেয় না। জাল বড়শী কেড়ে নেয়। গরু ছিনিয়ে নেয়। কেউ আবার পাখী শিকারেও নিষেধ করে। একটা বাঁশ পুঁতে জলের মাঝখানে রাখে। বুঝা যায় পাখীর ফাঁদ পাতা নিষেধ। দত্তখলা গোয়াল খলার কৈবর্ত নমস্যুদরাই ছিল মহাজনদের সেরা লাঠিয়াল। মহাজনের কর্মচারী লাঠিয়ালরা ছড়া বন্দুক হাতে নৌকা দিয়ে টহল দেয়। দোর্দণ্ড প্রতাপ তাদের। ওদের হাতে ধরা পড়লে রক্ষা নেই।

আশ্বিনের শেষে মরা নদীর মুখে সাতক থেকে আনা নলের বাড়ি দিয়ে মুখে বান্ধ দেয়। অগ্রান মাস এলেই বিলের পাড়ে খলা বানায় মহাজনরা। বিরাট বিরাট বেড়জাল নিয়ে মাছ ধরতে নামায় জেলেদের। কাতল, চিতল, রুই, গনিয়া, টেংরা, বজরী, পুটি, গাগট, শোল গজার কোন কিছুই বাদ

পড়ে না। ঝিলের পাড়ে খলার ওপর শামিয়ানার মতো জাল টাঙিয়ে রাখে। কাক চিলের হাত থেকে বাঁচাতে।

নারী পুরুষ কাজ করতে বসে। বিধবাদের সংখ্যাই বেশী। প্রথম আঁশ ছাড়ায় পুরুষেরা। বিরাট বিরাট বটি দা নিয়ে খচ্‌খচ আঁশ ছাড়ায়। আঁশ ছাড়ানো মাছ ছুঁড়ে দেয় আরেক বিধবার কাছে। ওরা মাথাটা আলাদা করে। অন্যরা আবার সেই মাছের পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে। কাটা মাছ রোদে শুকোতে দেয় পুরুষরা মাচার ওপর। মাছের গন্ধে মাছি ভনভন করে। পচা মাছের দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়ায়। তার মধ্যে শত শত লোক দিনরাত অবিশ্রান্ত কাজ করে যায়।

জল শুকোতে আরম্ভ করলেই আমাশয়, ওলাওঠা এখানে স্থায়ী বাসা বাধে। মানুষ মরে বিষ-দেওয়া জলের মাছ মরার মতো। ঔষধ পথ্য বড বিরল। ডাক্তর বৈদ্য নেই বললেই চলে।

এমনি একটা বিলের নাম বাঘজোড। ইজারা রাখে বাঞ্ছারাম সংকার। চল্লিশ-পাঁচচল্লিশ জন মেয়ে-পুরুষ বাঞ্ছারামের খলায় রোজ কাজ করে। খলায় যখন কাজ চলে লোকজন খলাতেই খায়, ঘুমায়। যজমানি দিয়ে বসন্ত ঠাকুর চলতে পারে না। অনাহারের জ্বালায় দিশেহারা। বাঞ্ছারামকে বলে কয়ে কোনরকম মাখনকে খলায় পাচকের কাজে ঢুকিয়ে দেয়।

ভোরের আকাশে যখন ক্লান্ত জেলের চোখের মতো তারাগুলো বিবর্ণ হয়ে ওঠে মাখন তখন খলার উনুন ধরায়। মাছ ধরার জেলেরা ডুলা নিয়ে বেড়জাল কাঁধে করে বিল গাঙে ছোটে। কয়েক খেউ দিয়েই তাদের ক্ষুধা বাড়ে। ক্ষুধা কি সাধারণ ক্ষুধা। সময়মত খাওয়া না পেলে ঠাকুরকে পর্যন্ত গিলে খাওয়ার মত অবস্থা দাঁডায়। তাডাহুডো করে কডাই, হাঁড়ি উনুনে চাপায় ঠাকুর। সঙ্গে যোগালী চারজন মেয়েছেলে। আগে ছিল তিনজন। ঠাণ্ডার মা, তুফানী দাস আর সীতা। মশলা বাটার জন্য পরে এসে যোগ দেয় সুমিত্রা। শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা খলার কাজে আসবে কোনদিন ভাবতে পারে নি। সুমিত্রারও ধারণা ছিল না মশলা বাটার কাজে এলে নিজের দুঃখে ফাটা বুকটাকেই বাটতে হবে।

সুমিত্রা আগের চেয়ে আরো অনেক সুন্দর হয়েছে। পিঠে বিশাল ঝরনার

মতো ছড়ানো চুলের রাশি। মশলা বাটে হাতের চুড়ি ঝমর-ঝমর বাজে। ঠাকুরের বুকে যেন মিষ্টি স্বরে একটা ঘুঙুর বাজে। রঙ কালো; তবুও দেহের গড়নে ছড়ানো ভরানো যৌবনের বেসামাল ভাব। ঠাকুর প্রথম দেখাতেই মনে মনে কঠিন শপথ নিয়েছিলো। যত কলাকৌশলই দেখাক না কেন, এবার সে শক্ত হবে। কিন্তু বললে কি হবে। শক্ত জমে যাওয়া মাখন অমন যৌবন উনুনের পাশে থেকে থেকে না গলে পারে না।

মাছ কাটুনি তুফানি বলেই ফেলে, ঠাকুরবাই! মশলা বাটুনির চাওনডা কইলাম বালা না! সাবধানে থাইক্য। সুমিত্রাও শুনতে পেয়েছিল। পেঁয়াজের বা রসুনের ঝাঁজে, নাকি পিরিতির জ্বালায় কাঁদে কে জানে। দিবানিশি শুধু চোখের জলই ফেলে। ঠাণ্ডার মা অভিজ্ঞা নারী। হৃদয় খুঁড়ে খুঁড়ে ব্যথা জাগাতে ভালবাসে। সুমিত্রাকে বাসন ধুতে গিয়ে বলে, বাওনের পুত সুন্দর গান গায়। তুই আইবার পর দেখি গান ছাইর্‌য়া দিছে। বুঝিনালো পুরুষের মন কোন দিক দিয়া খেউ মারে।

দেখতে শুনতে ঠাণ্ডার মা শান্তশিষ্ট। অল্পবয়সী বিধবা। ভরা যৌবনে বিধবা হলে কত জ্বালায় মানুষ জ্বলে পোড়ে। স্বামীর নাম রাইচান দাস। গোয়ালখলায় কৈবর্ত পাড়ায় বাড়ী ছিল। বেটে খাটো দুঃসাহসিক জেলে। পেয়ারী মহাজনের মহালের জেলে হয়ে রাতভর মেঘনার বুকে নৌকা নিয়ে খেউ মারতো। কি বর্ষা কি শীত, তিতাসের বুকে না, মেঘনার মোহানায় বেড় জাল টানতে ছুটতো। বিরাম ছিল না।

মেঘনার জল নীল। আরশির মতো স্বচ্ছ। জলের নিচে স্রোত বড় বেগবান। মেঘনা যখন খুশী নৌকা ভরে কাতল, চিতল, রুই, মিরগা উঠিয়ে দেয়। কখনো আবার মেঘনা ক্রুদ্ধ রাক্ষসী। তুফান এলে নৌকা ডোবে। শত শত লোক বোঝাই লঞ্চ পর্যন্ত টেনে মুচড়ে অতল তলে গ্রাস করে নিয়ে যায়। কখনো মাস্তুল ভেঙ্গে ছোট ডিঙ্গি নৌকার অসহায় জেলেকে পর্যন্ত পাল সহ গিলে গিলে অজগরের পেটে নিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা করে।

ঠাণ্ডার মা যখন গোয়ালখলার কৈবর্ত পাড়ায় বিপদনাশীনির পুজো দেয়, রাইচান তখন ঘন বর্ষায় মেঘনার বুকে জালের খেউ মারে। ভৈরবের কুরে পাল আটকে যায়। নিচে ডুবে জাল না ছাড়ালে কিছুতেই

জাল আসে না। অন্য জেলেরা ভয়ে কেউ নামতে রাজী নয়। ভৈরবের কুর বড মারাত্মক। চক্কর দিয়ে জলের স্রোত ওখানে ঘোরে। বড় বড বেপারী নৌকা পর্যন্ত কোন কোন দিন সোজা করে ডুবিয়ে দেয়। মেঘনার অতল গহ্বরে গলুই পর্যন্ত পুতে রাখে। কুর না যেন, কয়েকটা মত্ত হাতির শক্তি নিয়ে জল সেখানে উন্মত্ত হয়ে নাচে। দুনিয়ার যত মাছের ঝাঁক কুরের মধ্যে ঘোরে। কোনরকম একটা খেউ মারতে পারলে, দশ খেউয়ের মাছ এক খেউয়ে ওঠে। কুর যেন কোন দুর্ভেদ্য দুর্গ। ভিতরে মৎস্যনারীরা খেলা করে। সেই দুর্গে ঢুকে মৎস্যরানীর দেখা পাওয়া জীবন বাজী ধরলে সম্ভব।

কেউ নেমে জাল ছুটাতে সাহস করে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। রাইচানের অত দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভালো লাগে না। কৈবর্তের পুত অইয়া কুরে নামতে ডর লাগলে কেডা খাইব এই কাম করত। ঝাপ দেয় কুরের ভিতর। জাল ভাঙা নৌকার ডুবন্ত গলুইয়ে আটকে গেছে। গলুই থেকে জাল খুলতে গিয়ে নিজেই জালে জড়িয়ে যায়। নিশ্বাস আটকে সেখানেই মারা যায় রাইচান।

দুদিন পর মহালদার এসে ঠাণ্ডার মাকে খবর জানায়। ঠাণ্ডার মার আর কেউ নেই। তিন মাসের শিশু ঠাণ্ডাকে নিয়ে বিলের খলায় খলায় মাছের পেট কাটা, মাথা আলগা করার কাজে ঢোকে। মানুষের দুঃসময় এলে একসাথে বিপদ আসে অনেক দিক থেকে। বাঘজোড বিলেই কাজ নেয়। পুরুষেরা মাছের আঁশ ছাডিয়ে মাছ ছুঁডে দেয় বিধবাদের কাছে। বড বটিদা নিয়ে বিধবারা মাছের গলা কাটে, পেটের নাডিভুডি বের করে। তখন রাত দুপুর. ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু। কোলে আবার শিশু। ঘুমের ঘোরে মাছের গলা কাটতে গিয়ে কোলের ঘুমন্ত শিশুকেই কেটে ফেলে। তখন থেকেই বাঘজোড বিলের আরেক নাম পোলাকাটা খলা।

দুঃখ ভরা বুক চাপডে চাপডে ঠাণ্ডার মা খলায় খলায় কাজ করে।

সন্তান স্বামী সব হারালেও যৌবন আছে। কখনো কখনো স্বামীর সুখভরা স্মৃতি উঁকি দেয় মনে। ভালোবাসার মর্ম তাকে কাঁদায়। কাঁদায় বলেই সুমিত্রার না বলা ব্যথা বুঝতে পারে। বিচ্ছেদের গান তাকে উতলা করে। বুকে ওঠে শূন্য এক হাহাকার।

সুমিত্রা একদিন ভোরবেলা উনুনের পাশে ঠাকুরের কাছে মিনতি করে বলে, অনেক দিন ধইর‍্যা ঠাকুর তুমি গান গাও না। আইজকা বিচ্ছেদের গান গাওন লাগব। ঠাকুর নির্বাক। চুপ করে আপন মনে লাকড়ি ঠেলে ঠেলে বিড়ি টানে। সুমিত্রা নাছোড়বান্দা। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে নিঃশব্দে ঠাকুরের পায়ের কাছে পড়ে। আবেগ জড়ানো গলায় আবার মিনতি করে, ঠাকুরবাই! অবলা মাইয়্যা অইয়া একটা কথা কইলাম। হেইডা বুঝি তোমার মনে লয় না। ঠিক আছে, কালকা থাইক্যা রসুই ঘরে থাকতাম না। খলার কাজে যামু। শান্তিতে থাইক্য তুমি। অভিমানে ব্যথায় কাতর চোখের মধ্যে ছিল ব্যাকুল বাসনার এক আর্তি। সেই আর্তির সামনে ঠাকুরের নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে অদ্ভুত আবেগে। সুমিত্রার কান্না জড়ানো কণ্ঠের শব্দগুলো বুকে বটি দায়ের আঘাতের মতো লাগে। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ঠাকুর গলায় সুর তোলে—

শ্যাম বিনোদিয়া
হায়রে, রস বিনোদিয়া
প্রভাতে রাধার কুঞ্জে
আইলা কি লাগিয়া।
ছুইওনা ছুইওনা শ্যাম
দূরে গিয়া বসো
কালিন্দি যমুনার জলে
স্নান করিয়া এসো
তোমার অঙ্গে দেখি ছিন্ন ভিন্ন
পায়ে শিশিরের রেখা
মাথার উপরে ময়ূরের পাখা।

জেলেরা কাছে পিঠে কেউ নেই। একেবারে স্বাধীন বাঁধন হারা সুর। গানের এক মরমী মূর্চ্ছনায় বিভোর হয়ে ওঠে রসুই ঘর। দেখতে দেখতে সুমিত্রা অন্য এক পৃথিবীতে চলে যায়। ঠাকুরের মাথায় ময়ূরপাখা খোঁজে। কখনো আলিঙ্গনে বিভোর হয়ে ঠাকুরকে জড়িয়ে ধরে। লজ্জা সরম উড়ে গেছে উনুনের ধোঁয়ার মতো। এত দিনের হারানো সুর নতুন বেগে ছুটে চলে।

বর্ষায় টলোমলো তিতাসের বেগবান ধারার মতো। ঠাকুর যেন এক নতুন অবতার হয়ে দু'বাহু তুলে নাচ শুরু করেছে। লোকজনের সামনে ঠাকুরের সাথে সুমিত্রা কথা বলতো না। তবে ঠাকুরের সাথে সুমিত্রার বায়াপিরি কথা তখন খলার মুখে মুখে রসের কথা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বাঞ্ছারাম মহাজন কার্তিক মাসে বিলের খলায় গঙ্গা পূজার আয়োজন করে। মাখন ঠাকুরই পঞ্জিকা দেখে দিন তারিখ বেছে নেয়। তিথি অনুযায়ী বাঞ্ছারামের বৌ, ছেলে মেয়ে, জামাই দল বেঁধে আসে। গ্রামের মোড়ল আত্মীয় স্বজনরাও এসে ধূমধাম করে ভিড় জমায়। মাটির বেদী বানিয়ে মূর্তি বসানো হয়। ঢাকীরা বাজায় ঢাক। মোড়লরা তামাক টেনে গল্প বলে। কেউ আবার পানের থালার পাশে বসে চিবোতে থাকে। নতুন ধুতি পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে বাঞ্ছারাম ব্যস্ত। অখিল সরকার আর গি রশ মোড়ল গাঁজায় দম টেনে বিভোর হয়ে বসে।

বাঞ্ছারামের বৌ ঘোমটা টেনে উলুধ্বনি তোলে। সেদিন মাছ ধরা নিষেধ। কর্মচারী, জেলে, ভালো কাপড়ে সেজেগুজে, চুল পরিপাটি মাথায় এদিক ওদিক ঘোরে। বিলের মধ্যে মাছ। বাইরে থেকে হিসাব করা কঠিন। গঙ্গার পেটের খবর কেউ জানে না। গঙ্গা খুশী হলেই ঢেউ ভরে ভরে সোনা রূপা দেবে। গঙ্গা যদি কোন দোষে রেগে ওঠে সর্বনাশ। মাছ ধরা দূরের কথা ওলাউঠা বসন্ত আরো দুর্যোগ আসবে, কেউ আটকাতে পারে না। শুচি শুদ্ধ না হয়ে বিলে যাওয়া নিষেধ। মহাজন বাড়ীর বৌ, মেয়েরা সোনার গয়না ঝকমকিয়ে বিলের দিকে তাকায়। তুফানি, সীতা, সুমিত্রা ওরা তখন লাজুক চোখে মহাজন বাড়ীর বৌ মেয়েদের রসুই ঘরের আড়াল থেকে দেখে। বড় লোকের বউ মেয়েদের কত সুখ জানি। বসে বসে খায়। জলে কাদায় পা ডোবে না। ঐশ্বর্যে ভরা মন্থর রাজসিক চাল চলন বিস্ময় জাগায়। এমন সময় ঠাণ্ডার মার আঁচল কে যেন পেছন থেকে টানে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাতেই দেখে মাখন ঠাকুর। সাবান, সুবাশী তেল ঠাণ্ডার মায়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলে, ঠাণ্ডার মা, লুকায়া লুকায়া জিনিসটাইন দিয়া লাও। চতুর মহিলা ঠাণ্ডার মা। এত ধূম ধাম হৈ চৈ-এর ফাঁকে চুপি চুপি প্রসাধনের সাখগ্রীগুলো স্নানের ঘাটে সুমিত্রার আঁচলে চাপিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুর কইছে, মন বাইন্দ্যা রাখিস।

চুলের কাঁটা পাইবা, আলতা পাইবা। ডিম সাবানঅ কিন্যা দিব। গাঙ বিলের বদ্ধ জলে বর্ষার প্লাবন নামার মতো সুমিত্রার ম্লান মুখে হাসির রেখা ফোঁটে। মহাজন বৌদের চেয়েও নিজেকে সুখী লাগে। তবুও একটা লাজের ছটায় ঠোঁটের কোণায় শাড়ীর আঁচল চিবিয়ে বলে, দিদিলো ঠাকুরবাই খাওন খাইবার সময়নি পাইছে ?

ঠাণ্ডার মা তখন গুনগুনিয়ে ভাটিয়ালী সুরে গান ধরে। একসময় খলার কাজও শেষ। মাখন কাজের খোঁজে নমসুদ পাড়া আর কৈবর্ত পাড়ায় ঘুরে-ফেরে আবার।

তবু আনন্দ ওঠে ভাদ্র মাসের পয়লা তারিখ নৌকা বাইচে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া তিতাস নদীর ওপর। মেড্ডার কালভৈরবের ঘাট থেকে সুরু, শেষ হয় কুরুইল্যা খালে শিমুলকান্দির পাশে। রসুলপুর থেকে মাখন ছোটে দল নিয়ে সরঙ্গা নৌকা করে। নৌকার মাঝে রামপুরের কৈবর্ত সর্দার হৃদয় নাগ। বৈঠা ধরে পঞ্চাশ জন। কারালী হলো রামাচরণ। নৌকার যে হাল ধরে তাকে বলে কারালী। রঙ বেরঙের নৌকা। রসুলপুর, গোয়ালখলা, পত্তন, হরিণবেড়, হরিপুর, গ্রাম থেকে আসে সরঙ্গার নৌকার ঝাঁক। কোন নৌকায় ঠিকরা, সানাই, ঢোলক বাজিয়ে গান গায়। কেউ আবার পাতাসী নৌকা নিয়ে আসে দক্ষিণ থেকে বিশেষ করে কুড়ি, ধরকার বৈশুল, সাড়ির পাড়া, বরুনকান্দি।

কেউ আবার নৌকায় ওঠে গাঁজা টানে। দর্শকরাও থাকে ছইয়া নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে তিতাসের বুকে ভাসতে ভাসতে। আনন্দবাজার তখন আনন্দমুখর। কেউ আবার গামলা বাইচে। মটির গামলায় ভাসতে ভাসতে ছোটে। কেউ দৌড়ে ছুঁচলো মুখের কুশা নৌকা নিয়ে। লালপুর, সরাইল, কালিগচ্ছ, বাকাইল, কুচুনি, বুড্ডা থেকে মেয়েরা থাকে ছইয়া নৌকায় চড়ে। তিতাসে ওঠে হাজারো মানুষের কলরব। মাখন তখন গান ধরে—

তুমি কেন দেওর অইলানা
রঙিলা ভাসুরও
তুমি কেন দেওর অইলানা।

তুমি যদি হইতায় দেওর
খাইতা বাটার পান
রঙ্গে রসে কথা কইতাম
জুড়াইতাম পরান।

সঙ্গে বাঁশী, সানাই বাজে। বাজে হৃদয়ের জলন্ত তন্ত্রী। তিতাসের পাড়ে পাড়ে জাগে মুখরিত চাঞ্চল্য। গানের তালে তালে বৈঠা বাঁওয়ার তালিম দেয়—ভালো হৈ রে হৈ।

কেউ বলে ব্রাহ্মণবাইড্যার এস ডু'র মেলা। কেউ বলে নৌকা বাইচ। প্রতিযোগিতা শেষ হলে কাপ মেডেল খাসি পুরস্কার। ভাদ্র রোদ বড় প্রখর। কখনো আবার আকাশ থেকে মেঘ পড়ে ঝিরিঝিরি। দর্শকরা কেউ ছাতা মেলে। কেউ আবার নৌকায় ঘুরে ঘুরে পান বিড়ি বিস্কুট বেচে। মাখনের দল প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হয়। একটা রূপার কাপ নিয়ে বাড়ীর পথে নৌকা ছাড়ে উদ্দাম নাচন নেচে। নৌকা বদর বদর রসুলপুরের দিকে এগোয়।

জল ছাড়া মাছ বাঁচে না। গাঙ-বিল হাওর ছাড়া কৈবর্ত নমসুদরাও জীবন বাঁচাতে পারে বলে ভাবতে পারে না।

পাশাপাশি পাড়া। মিশ্র বসতি সাধারণত থাকে না। আপন আপন জাতিগোষ্ঠী নিয়েই তাদের সমাজ, জীবনের প্রবাহ। মাছ ধরে, মাছ বেচে। কৈবর্তের সঙ্গে মাছ ধরার কায়দাকানুনে নমসুদদের বিস্তর ফারাক।

নদীর চরে বিষকাঠালি গাছের বন। অনেকটা মরিচ ক্ষেতের মতো। রাধাচরণ নমসুদ, মাখনের বন্ধু। বিষকাঠালির বন তুলে কাঠের পিঁড়িতে ছেঁচে ছেঁচে মেশায় চুনজল। দুজনে স্যাঁতসেঁতে কচু বনে ঘোরে। যেখানে কেঁচোর মাটি দলিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতো স্তূপ হয়ে উঠেছে, কাঠালি বিষের ঝাঁঝাল জলের রস সেখানে ছড়িয়ে দেয় মাটির ভেতর থেকে কিলবিল করে কেঁচোর ঝাঁক বেরোয়। কেটে কেটে জিরের টুকরো বাঁশের গুছা নামের মাছ ধরার ফাঁদে ঢুকায়। বিলের জলে গুছা পাতে। বর্ষায় ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ পেয়ে মাতোয়ারা কই মাছের ঝাঁক গুছার ফাঁদে ধরা দেয়। ঝাঁকে ঝাঁকে।

কখনো আবার চোঙার মতো বাঁশের বেলুন। চান্দুরা বাজারে ওষুধ

বিক্রেতার চিৎকার করার টিনের চোঙের মতো আকারে। একদিকে মোটা, অন্যদিকে সরু, কৌণিক। অনেকটা শঙ্কুর আকৃতি। দল বেঁধে কোমর জলে হাঁটে, গোল বিশাল বৃহদাকার পথে। পা যেখানে ডোবে, কাদার মধ্যে গর্ত হয়। ঘুরে ফিরে সেই পথের দাগে বেলুন দিয়ে চাপ দিলে শিং মাগুর ঢোকে। ডুলা ভরে শিং, মাগুর ধরে। নমস্যুদদের মাছ ধরার এই পদ্ধতি মাখন ঠাকুরও দেখতে দেখতে শিখেছে। তবে শিং মাছের ঘাই খেয়ে দুদিন জ্বরেও ভোগে। পুঁটি মাছের চোখ টিপে লাগায় রস। শামুকের জল মাখে, চুনের প্রলেপ লাগায়। ব্যথা তবু কমে না।

নৌকায় চড়ে কেউ ফেলে খরা জাল। ত্রিভুজের মতো তিনটি বরাক বাঁশের নীচে বিরাট জাল ঝুলতে থাকে। বিলে-গাঙে জাল ফেলে জাল তোলে। মাছের খেউ ওঠে নৌকা ভরে। মাছের নেশায় ভোঁদরের মতো দিনরাত বিলে বিলে ঘুরে বেড়ায় মাখন ঠাকুর। মাখনের কাকা অতিষ্ঠ হয়ে বলে ওঠে, বাওনের পুত! চাড়ালের লগ ধরছ। বুঝবা দিন কেমনে যায়। উপেক্ষা করে বর্ণ হিন্দুরা নমস্যুদদের বলে চাড়াল। কৈবর্তদের বলে গাবর। চাড়াল আর গাবর নিয়েই মাখন ঠাকুরের পৃথিবী।

কৈবর্ত বাড়ি না হয় নমস্যুদ বাড়িই তার ঠিকানা। পাড়ায় পাড়ায় আচার-অনুষ্ঠানে তাদের সাথেই মিশে থাকে। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে, লাফিয়ে ছোটে পাড়া থেকে পাড়ায়।

রসুলপুরের মাঠে বিকেলে গরু চড়াতে গেছে পূর্ণ দাস। বিলের পাড়ে জারুল গাছের নীচে বসে গল্প করে তার ছেলে গোলকবাসী। কখন তাদের হালের কালো বলদটা হারিয়ে গেছে জানে না। খুঁজতে খুঁজতে তিনদিন পার হয়। তবু গরুর খোঁজ মেলে না। ইসলামপুর, নাজিরা বাড়ি, মণিপুর ঘরে ঘরে হন্যে হয়ে ঘোরে গোলকবাসী। গরু পাওয়া দূরের কথা। নানারকম কথা শোনে গরু খুঁজতে গিয়ে। কেউ বলে চান্দুরা বাজারে চুরি করে কেউ হয়তো গরুটা বেচে দিয়েছে। কেউ বলে ইসলামপুরের কাদির মিঞা সেদিন এসেছিল রসুলপুরে। লোকটা গরু চোর। দূরের কোন গ্রামে নিয়ে গরুটা বেচে দেওয়াটা অসম্ভব নয়। আবার বিজ্ঞের মতো সোনাধন দাস বলে, গরু

টুকায়া পাইবা কই ? নাজিরাবাড়ী হাসমত উল্লার ঘরে গত কালকা বিরাট সিন্নি গেছে, দেখ হেইখানেনি গরুটা কোরবানি দিছে।

গিয়েওছিল নাজিরাবাড়ি। গরুর কোনো হদিশ পায়নি গোলক দাস। শেষ পর্যন্ত উপায় না দেখে এলো বসন্ত ঠাকুরের কাছে। সব শোনে বসন্ত ঠাকুর। বলে, দেখ, ভাল কইর‍্যা একটা কলকি নারায়ণের পূজা দে। গরু ক্যারে, নাও হউক, সোনার গয়না হউক, ছাগল হউক, হগলতা চুরি অইলেও ফির‍্যা পাওন যায়। ডাকের কথায় কয়, কলকি নারায়ণের সেবা দিলে বুলে হারাইন্যা ধন ঘর লয়। কাটা মাথা জোড়া লয়। আপুতার পুত হয়।

—কর্তা কলকি নারায়ণ পূজা দিতে কি লাগে !

—বেশি কিছু লাগত না। সোয়াসের বাতাসা, সোয়া পন কলা, তিনটা রাখাল, তিনটা পাজন, আর ধূপবাতি তিনটা, এইই। দিনটা খালি শনি-মঙ্গলবার অইলে ছাড়ে।

গোলকবাসী আয়োজন করে কলকি নারায়ণ সেবার ! উঠোনেই আসর। মঙ্গলবারে গোধূলিবেলায়। ব্রাহ্মণ লাগে না পূজার। তবু নিয়মকানুন, আচার অনুষ্ঠান দেখতে মাখন ঠাকুর যায়। তিনজন রাখাল অমরচান, রাধাচরণ আর ব্রজবাসী বসে উঠোনে। মাঝখানে তিনটে পাজন বসানো ত্রিভুজের মতো করে। ত্রিভুজের তিন কোণায় এক এক কলকিতে তিন ছিলিম তামাক। থালায় কলা, বাতাসার ভোগ। তিনটে সরষে তেলের প্রদীপ বসায়। একজনে পরস্তাব বলে। পরস্তাব মানে একটা গল্প। গল্প শুরু করে ব্রজবাসী। উঠোনে আরো পনেরো বিশ জন লোক। সবাই তখন নীরব। গল্পের আসর জমে। বিজ্ঞের মতো বলে যায়, এক বাওন যজমান বাড়িত গেছিল শ্রাদ্ধ করতে। শ্রাদ্ধে পাইছিল একটা গরু। যজমানের বাওনে কইছে, গরুটা যে দিলা, রাখালি করব কেডা। তোমার গরু তুমি দিয়ো না। যজমানে কইছে, কর্তা ইটা কি কন। রাখাল যদি না থাকে আমার ছোট পোলারে রাখাল কইর‍্যা লয়া যান। হের পরেদা যজমানের ছোট পুতরে বাওনে মুনি কইর‍্যা বাড়িতে আনছে। মুনির কামর কইর‍্যা দিন যায়। গরুও রাখালি করে। একদিন দেখে গরুটা হারাইয়া গেছেগা। তখন করন কি। তিন রাখাল মিল্যা কলকি নারায়ণের সেবা দিছে গাছ তলাতে। কলকি পাইব কই, ঠাকুরের

আসন পাইব কই। তিন রাখালের পাজন পাইত্যা আসন বানাইল, দূর্বা ঘাসের চটস্থা তামুক আর টিক্কা বানায়। কলকি পাইছিল এক গিরস্থের কাছ থাইক্যা। খুইজ্যা। হেইরকম পূজা দেইখ্যা ঠাকুরের মন গলছে। গরুটা কতদূর পরেই দেখে বাড়িত আইয়া পড়ছে। এমনি করেই পূজা শেষ। উঠোনে কলকি নারায়ণের ধ্বনি ওঠে তিনবার।

বলো, বলো, কল.ক নারায়ণ প্রীতে

বল হ.রি, বল হরি,

মাখন জানে পূজার আচার। হারানো গরু পেলেও না পেলেও অদ্ভুত এক গভীর বিশ্বাস নিয়ে কলকি নারায়ণের এমন তর আসর প্রায় বাড়িতেই জমে। এতেও যারা সন্তুষ্ট নয় তারা তিননাথের মেলা বসায়।

ঢাক, করতাল, খোল নিয়ে আসর জমে। থালা ভরে কলা, বাতাসার প্রসাদ। এক একজন এক একজন ওস্তাদ গাজা মলতে। কেউ আবার ছিলিম ভরে গাজার ওপর টিককা ধরায়। ছিলিমের ন্যাকড়া ভিজিয়ে টান মারে। কেউ বলে মহাদেবের নেংটি। মহাদেবের নেংটি শুকিয়ে গেলে আবার ভিজায়। ছিলিম হাত থেকে হাতে ঘোরে। বড ভাই রাধাচরণও আসারে বসে দম মারে। অন্যদিকে তাকিয়ে ছোটভাই প্রাণনাথ হাত বাড়ায় কলকি নিতে হাতে। সবাই মহাদেবের ভক্ত। ধর্মতত্ত্বের অত সার মর্ম বুঝে না। দম দিয়ে বিভোর হয়ে থাকে অন্য লোকেগিয়ে আনন্দধারায় ডুবে থাকে। টিককা পুডে টিককা জ্বলে। গানও চলে, দমে বিভোর প্রফুল্ল গাইনের গলার স্বর চড়িয়ে।

তিন পয়সাতে হয় যার মেলা।

কলিতে হয় ত্রিনাথের মেলা।

সাধুরে কই এক পয়সার সিদ্ধি আইন্যা

তিন কলকি সাজাইও

ওরে গাজায় মারছে দম বলছে বোম বোম

ভ্রমে ভবে ভোলানাথ

কলিতে হয় ত্রিনাথের মেলা।

সাধুবাই এক পয়সার তেল কিনিয়ে

তিন বাতি জ্বালাইও।

ওরে বাই বাতি জ্বলছে ধীরে
নিভে নারে এ কিরে আজব লাল.
এক পয়সার পান কিনে
তিন খিলি বানাইও
ওরে সাধু গিরি পানের খিলি
বসে বাজায় একতারা
কলিতে ত্রিনাথের মেলা।

গাজার দম দিয়ে তিননাথ ভোলানাথ। মাখন, নন্দ, রাধাচরণ। নিভে যাওয়া বাতি দেখেও মনে নিভে না। যখন সেটা বুঝতে পারে গড়িয়ে গড়িয়ে হাসে। দুজন যায় মাখনকে পৌছে দিতে। মাখনও বাড়ীর দরজা থেকেই ফিরে আসে রাধাচরণকে পৌছে দিতে। রাধাচরণও দরজায় গিয়ে আবার আসে মাখনকে পৌছে দিতে। কেউ কাউকে পৌছে দেয় না। শুধু রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়। তবু তিন ভোলানাথের ভোলা পথের দিশা মিলে না। ভুল যখন ভাঙে তখন আবার হাসে। খেতে গিয়ে জিভটা যেন কড কড় ভিতর দিকে টানে। মনে হয় খাওয়া হয়নি। এক থাল শেষ, দুই থাল শেষ। তবে মনে হয় খাওয়া হয়নি। অদ্ভুত নেশা মানুষকে শুধু ভোলায়। কেউ ভোলে দেহের ক্লান্তি, কেউ ভোলে অভাবের জ্বালা, কেউ ভোলে পিরিতির জ্বালা। সহজ কথায় ভুলে থাকার নেশা। সব ভুলে থাকার নেশার নাম-ই ভোলানাথের নেশা, ওই ভোলার পথে কৈবর্ত, ব্রাহ্মণ নমস্থদ এক সাথে বিচরণ করে। গ্রাম থেকে গ্রামে ডিঙ্গি নৌকা বেয়ে চলে নমস্থদরা। মাঝির কাজ জানে ওরা। কৈবর্তদের মতো বেড জাল, বড জাল, জগৎবেড জাল, কাছিম জাল বা অডহডিয়া জাল ধরা নমস্থদরা ততটা অভ্যস্ত নয়। কৈবর্তরা পৃথিবীটাকে বেড় দিয়ে মাছ ধরতে চায়। নমস্থদরা চায় ছোট গণ্ডীর মধ্যে জাল বাইতে। দুই জনগোষ্ঠীর মন দরিয়ার মতো স্বচ্ছ সরল। অতশত প্যাচপেচে বোঝে না। শরীরে আবার অসুরের মতো শক্তি। যে দিকে যায় একদিক করে আসে। জাঙাল ভাঙা জলের স্রোতে ধারার মতো।

মাখন তাদের ওপর ভরসা রাখে। আপদে বিপদে বুক ভরা সাহস নিয়ে

পাশে দাঁড়াতে জানে। পালাবার কৌশল ঈশ্বর তাদের রক্তে দেয়নি। তাই মরতে জানে মারতে জানে মাথা নত করে নিজে বাঁচতে জানে না।

সহজ সরল মানুষ বলেই মহাজনদের ফাঁদে ওরা ধরা দেয়। এক তোলা সিদ্ধি একটা আস্ত খাসি, সঙ্গে দশ বিশ টাকা পেলে পৃথিবীটাকে কাত করে দিতে কসুর করে না। গাঙ দখল, জমি দখলে লাঠিয়াল হয়ে কত লোক মরে সেই হিসেব রাখে না। বরং সেই মৃত্যু বীরের ইতিহাস হয়ে রূপকথার মতো গ্রামে গ্রামে ছড়ায়।

কার্তিক মাসের অভাব বড় কঠিন। এক মুঠ ধান থাকে না কৈবর্ত্ত নমসুদদের ঘরে। জলেও তখন মাছের আকাল। কার্তিক মাসে শিশির আসতে না আসতেই শুরু হয় মরা গাঙের মুখ বাঁধাব আয়োজন। গাবের মটকি জ্বাল দিয়ে জাল রাঙানোর কাজ, জাল বোনা, নৌকা মেরামত সব এক সাথে। কারো ঘরে কানা কড়ি থাকে না। সারা বছর রোজগার করলেও দিন আনে দিন খায়। সঞ্চয় বলে কিছু জানে না। ঘরে খোরাক যখন থাকে না কেউ ছোটে জমি বন্ধক দিতে। কেউ ছোটে গরু বেচতে।

সুমিত্রার সঙ্গে যেমন নিবিড় সম্পর্ক তেমনি নন্দর সাথে ঘনিষ্ঠ বায়াপিও কম নয়। নন্দর বাপ সোনাধন মাখনকে ছেলের মতো ভালোবাসে। আপদে বিপদে কাজে কর্মে মাখন ঠাকুরকে পাশে পাশে নেয়। ভাল মন্দ পরিবারের সব কিছুতে সোনাধন মাখনের পরামর্শ চায়। মাখনেরই পরামর্শে সোনাধন গেলো বিপিন মহাজনের ঘরে। আগাম ঋণ চাইতে আর কাজকর্মের বন্দোবস্ত করতে।

বিপিন মহাজন বৈঠকখানায় বসে। হাতের আঙুলে নীলা লাগানো সোনার আংটি। ঘরে একটা পালঙ্ক। সিংহের পায়ের মতো পা। গড়গড়া সামনে রেখে তামাক টানে। কৈবর্ত মোড়ল সোনাধন ধাড়ি পেতে বসে। নন্দ আর মাখনও সঙ্গে। সোনাধন কাচুমাচু করে এক ভূমিকা দিয়ে প্রস্তাব করে ঋণের—বাবু! আপনারা অইলেন দশের মাথা। কথা অইল কোন রকম একটা মহাল বানাইতাম। টেকা পয়সা নাই। ভোলার জোয়ার আইবার আগে কিছু ঋণ টিন যদি দেন। তবে ঠাকুরে বাচাইব আর কি। ছাওয়াল লইয়া অখন অক্করে মরতাম পড়ছি।

বিপিন মহাজন কম কথা কয়। রাশভারী লোক বলে, চাতল বিলডা ডাইক্যা আনছি। হেই বিলে তোমারে মাছ ধরতাম দেমু। মহাল বানাও জাল নৌকা কিন্যা। তবে কইলাম দামদর অখন ফুরান যাইত না। সময় অইলে ইতান ঠিক করুম। ঋণ চাও ঋণ দেমু। তবে কথা অইল, তোমার বাই ভাতিজা মিল্যা লোকজন কম না। দেখ কোন রকম অবন্যারেনি জমিন থাইক্যা তুলন যায়। তিন কানি জমিন রন্ধক দিছিল। সুদের কথা বাদ দেও। আসলতাই উসল করতাম পারি না। দুই বছর গেলগা, অখনও খালি আইজ দেমু কাইলকা দেমু করে। তুমি যদি আমার লাইগ্যা হাটু জলে লাম, আমিও তোমার লাইগ্যা বুক জলে নামুম।

সোনাধন জবাব দেয়, বাবুর আশীর্বাদে, অখনও ডাক দিলে বিশ ত্রিশটা লাঠি বার অইব। বাবুর আদেশ পাইলে অবণ্যার মতো ফকিনির পুতরে তুইল্যা দেওন কোন ব্যাপার না। বাবু যদি কন, কাইলকা সকালে তার মাথাটা লয়া আমু।

কার্তিক মাসে খালে বিলে গাঙে জল শুকায়। চর ভেসে ওঠে। হাল চালিয়ে জমি চাষ করে। খেসারী কালাই বীজ বোনাব আয়োজন শুরু। অবনী সরকার রসুলপুরের বাসিন্দা। গরীব জেলে। তিন কানি জমি বন্ধক দিয়ে ছিলো বিপিন মহাজনের হাতে। ঋণ শোধ করতে পারেনি। হিসেবে ঋণের অর্ধেক দিয়েছে। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ হিসেব করায় ঋণ শোধ হয় না।

অবনী ভোর বেলা জমিতে হাল নিয়ে নামতেই সোনাধনের দল লাঠি বল্লম নিয়ে ছুটে আসে। অবনীর হাতের পাজন ছিনিয়ে পাজন দিয়েই গরুর হাল আর অবনীকে পিটতে শুরু করে সোনাধন। হালটাল ছেড়ে অবনী আইলের কাছে পড়ে যায়। অসহায় ভাবে অবনী কোনরকম রক্তের জখম সহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানার দিকে দৌড়ে।

বিজয়ী বীরের মতো সোনাধন গিয়ে হাজির বিপিন মহাজনের কাছে। বিপিন সব শুনে খুব খুশী। একটা খাসির দাম গাঁজার পৌটলা, সঙ্গে কিছু নগদ টাকা দিয়ে বলে, যাও সোনাধন চিন্তা কইর্য না।

সোনাধন একটু ভীত। থানায় গিয়ে অবনী কি করবে কে জানে।

তাছাড়া ওদের এক জাতভাই নতুন হাকিম হয়ে এসেছে। বিপিনবাবুকে বলে, বাবু, নতুন এস ডু বুলে নমসুদ। হেই বেডানি পুলিস পাঠায়া মাইর ধইর করে।

বিপিন হাসল এক অবজ্ঞা ভরা দৃষ্টিতে।—ইটা কি কস্ সোনাধন। নমসুদ্দার পুত এস ডু অইছে। তারে নমস্কার করব কেডা। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া গিয়া শোইন্য। হগগলতে কয় চারালের পুত এস ডু অইলে দেশটা চলব কেমনে। রবীন্দ্র নমসুদ অখন অইছে রবিবাবু। মানব কেডা। হের বাপে সারা জীবন মাছ বেচছে। শরীলে অখন নখদা আচড দিলে খডি মাটীর দাগ বয়। হেই বেডার ডরে তুমি মর ক্যারে।

বিপিনবাবু কি যাদু জানে কি জানি। মামলা মোকদ্দমা কিছুই হল না। জমি বেদখল হয়ে বরং অবনী দেশান্তরী হয়ে গেল।

ভোলার জোয়ার আসার দিন গুনে বসে রয় সোনাধন।

ভোলার জোয়ার হলো কার্তিক মাসে গাঙে বিলে মাছ আমদানীর জোয়ার। নদীর জলে জোয়ার আসলেই মাছ গিয়ে মরা গাঙে বিলে উঠবেই। যেদিন জোয়ার আসে তার আগেই বাঁশের চাটাই, খুটির বাঁশ, নারিকেলের দড়ি সব প্রস্তুত। কেবল জোয়ারের অপেক্ষা। জোয়ার আসতে না আসতেই পূর্ণিমার রাতে লোকজন নিয়ে ছোটে সোনাধন। সঙ্গে তার ছেলে নন্দ আছে। আর তার বন্ধু মাখন ঠাকুর। বিরামহীন ভাবে লোকজন কাজে নামে। কাঠের মুগুর দিয়ে খুঁটি পুঁতে বাঁশের চাটাই পাতে। নিশ্ছিদ্র না হলে হরহর করে বেরিয়ে যাবে। কত সাবধানতা। শীতে শরীর হিম হয়ে আসে। তবু মহালের কাজের ধারা যন্ত্রের গতিতে এগিয়ে চলে। মরা নদীর মুখ এমনি করেই বন্ধ রেখে মাছ আটকে রাখে।

মাছ ধরার মরসুম আসতেই সোনাধনকে ডেকে বিপিন মহাজন জানিয়ে দেয়—বিলের মধ্যে লাইম্য না। লামতে চাইলে দামদর ফুরায়া লাম। তিন মুনি, তুমি নিজে, নৌকা দুইটা, আর জাল—দিন পঞ্চাশ টাকা দেমু। পোষায়নি দেখ।

বাবু আর বাড়াতে রাজী নয়। সোনাধন বলে, ইটা কি কন! তিন

মুনির খাওন খরচ লম্বা দেওন লাগে ত্রিশ টাকা দিন, আমি পামুকি, জালের ভাড়া কি, নৌকার ভাড়া গেল কই।

অবশেষে বাবু ষাট টাকাতে কোন রকম ওঠে। সোনাধন দেখে দামদর করে লাভ নেই। অনিচ্ছায় হলেও বাবু প্রস্তাব মেনে নেয়।

সোনাধনদের সাথে মাখনঠাকুর খলায় কাজ করে। ক্ষিদের তাড়নায় মন্ত্র তন্ত্রের কথা মনে নেই। নন্দ, সোনাধন, রাধাচরণদের সাথে চাতল বিলে মাখনও থাকে।

পৌষের শীতে পৃথিবীটা জড়োসড়ো। সন্ধ্যে হতেই বাড়িতে লেপ মুড়ি দিয়ে মহাজনরা বিছানায় ঢোকে। কেউ আবার শখ করে গরম গরম মাছ ভাজা খায় বাংলা মদের সাথে। চাতল বিলের কর্মচারী দামী শাল গায়ে জড়ায়, নাক কান মাথা মাফলার দিয়ে ঢাকা। হিসেবের খাতা নিয়ে বসে। মহাজনরা বৌ নিয়ে লেপের নীচে মহাসুখে প্রেমের কথা কয়। মাঠে ধান নেই। বাতাস ঘোড়ার মতো ঠাণ্ডার চাবুক হাতে দিক দিগন্তে ছুটে। খালি পায়ের মানুষ পেলেই সপাং সপাং মারে।

বিলের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের ওপরে ধোঁয়ার মতো কুয়াশা ওড়ে। গাছ গাছালির পাতা থেকে টুপ টাপ শিশির পড়ে। কৈবর্ত বৌ-এর ঘরের মানুষ তখন বাইরে খলার কাজে। শীতে কাঁপা শিশুদের জড়িয়ে ছেঁড়া কাঁথায় ঘুমায়। গায়েব উত্তাপ লেগে লেগে পরস্পরকে জড়িয়ে থাকে। সারা দিন গাইল সিয়া মারতে মারতে হাত পা অবসন্ন। বিছানায় শুতে না শুতে চোখ বুজে আসে। তবু দুঃস্বপ্নের চমকানিতে ঘুম ভাঙে। খলার মানুষ তখন খলা থেকে বেরোয় রাত দুপুরে। সারা গায়ে তেল মেখে। চাদর কাপড় কিছুই নেই। কালো ঠোঁটে ঠাণ্ডা লেগে থির থির কাঁপে। কোন রকম জল গামছা কোমরে জড়িয়ে বিলের জলে নামতে যায়। নামার আগে দু' হাতের তর্জনীতে জল ছুঁয়ে কর্ণমূলে স্পর্শ করে। তারপর শীত উপেক্ষা করে জলে ঝাঁপ দেয়। পাঁচ হাত সাত হাত নিচে ডুবে জলের ভেতরে বান্ধের চাটাই পরীক্ষা করে। কোথাও কোন ফাঁক ফোঁকর আছে কিনা। দম ফুরাবার আগেই মাথা বের করে। ফাঁক ফোঁকর পেলে ওপরে নিয়ে বান্ধে চাটাইএর বেড়াতে মুগুর দিয়ে আঘাত করে। ফাঁক ফোঁকর থাকলে হরহরিয়ে বিলের মাছ বেরিয়ে যাবে। কোথাও আবার বাঁশের চটী ভেঙে গেলে মেরামত করে নতুন চটী লাগায়। জলের

নিচে মটির কাদায় হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে যখন ফাঁক খোঁজে, কারো হাতে শিং মাছের ঘাই লাগে। কখনো বড় মাছ কাতল রুই লাফ দেয়। ফুসফুসের কাছে তিন সের চার সেরের মাছ যখন আঘাত করে, বুকের হাড় ভাঙতে পারে। এমন করে এই শীতের রাতে ত্বার করে পরীক্ষা করতে হয় বান্ধের মুখ।

কখনো বিলের বুকে নৌকা নিয়ে ছোটে। ছুটো ডিঙ্গি নৌকা পাশাপাশি চলে। নৌকার ওপরের কিনারাকে বলে বাতা। চলতে গিয়ে বাতায় বাতায় ঘষা খায়। অসতর্ক হয়ে থাকলে হাতের আঙ্গুল ছেচে গুড়া করে দিতে পারে।

দশটা জেলে বৌ যেমন মানুষ নিয়ে দুশ্চিন্তায় রাত কাটায়। সোনাধনের মেয়ে সুমিত্রার বিয়ে হয়নি। তবু ওই মাখন ঠাকুরের জন্য বুকটা কেমন ধরাস ধরাস কাঁপে। বলতেও পারে না। বোঝাতেও পারে না। না বলা একটা ব্যথা বুকের ভেতর সিয়ার মতো দুমদাম আঘাত করে বাজে শুধু।

অগ্রহায়ণ মাস এলেই তিতাসের মানুষের ঘরে দু এক মুঠ ধান ওঠে। সেইটুকু নিয়েই শুরু হয় উৎসব। একদিকে চলে আমন ধান কাটার আয়োজন। সকালের বাসী ভাত, কেউ বলে করকড়া ভাত, কাকিয়ার শুটকী পোড়া, মরিচ পোড়া দিয়ে এক পেট ভাত খেয়ে ধান কাটতে যায়। এক এক দলে পনের বিশজন থাকে। মাথায় গামছা পরনেও গামছা। কোমরে তামাক টিককার পুঁটলি। রাধাচরণের জমিতে ধান কাটা শুরু। রাধাচরণ খড়ের বেনীতে আগুন ধরিয়ে হুকোসহ এগোয় সবার আগে। পেছনে পেছনে যুবকরা কাঁধে বাঁশের ভার রশিসহ চলে। কাস্তে চলে যন্ত্রের মতো, কার আগে কে মুঠ বাঁধবে। যাদের মুঠ বাঁধা শেষ, তারা তখন আইলে বসে কেউ গান গায়। কেউ তামাক টানে, কেউ আবার হাসানোর গল্প বলে।

রসুলপুরের মাঠের চাষীর কানে আরেক গ্রামের ধানা-কাটা চাষীর গান ভেসে আসে। বিরাট মাঠ, কেউ বলে তিতাসের হাওর। কেউ আবার সন্ধ কাটা ধানের মাঠে টুকরী নিয়ে শামুক দিয়ে হিজা খোঁজে। হিজা মানে কাচির ফাঁক দিয়ে কাটার সময় বাদ যায় কোন একটা ধানের ছড়া। গরীব বিধবা, অসহায় গরীবরা খুজে আনে সেই ধান। শামুকের মুখে ধান ছড়ার ডগায় টিপ দিয়ে হিজা কাটে। টুকরী ভরে। কেউ আবার ধানের ন্যাড়া কেটে জ্বালানী

জমায়। কোথাও আমন কাটা ধানের ক্ষেতে স্যাতসেতে জামতে শালুক কুড়ানী মেয়েরাও থাকে। কেউ আবার পাশের বোরো ক্ষেতের মাঝে জিয়ল মাছ খুজতে পেলইন দিয়ে ব্যস্ত।

তখন অমাবস্যার প্রতিপদ তিথিতে শুরু হয় হরি পরমেশ্বর ব্রতের আয়োজন। চান্দুরা বাজার থেকে মূর্তি কিনে আনে ঘরে ঘরে। মূর্তির অর্ধেক গৌর বর্ণ অর্ধেক নীল বর্ণ। বাড়ীর মেয়েরা আগের থেকেই উপোস থাকে। পরদিনের পরদিন কাল্পনিক কানাই বলাই গড়ে দুটো ছোট ছেলে ডেকে। উঠোনের কোণে। কৃত্রিম জমি বানায়। কানাই বলাই খালি লাঙল দিয়ে চাষ দেয়। মৈ চালায়। সেখানে ধান বোনে। পাকা ধানের গোছা কাটার ভঙ্গীতে খালি হাতে অভিনয় করে। আগের দিনের পাতা দৈ কানাই বলাই-এর মাথায় মাটীর ভাণ্ডে রেখে নাচে। মেয়েরা তখন দল বেঁধে উঠোনে গান ধরে—

বলাই দাদা লাটুম দেও আমারে
কি অপরূপ দেইখ্যা আইলাম খেলার মাঠে
কানাই মাইর‍্যাছে লাটুম
বলাই রইছে চাইয়্যা
স্বর্গে থাইক্যা মারে লাটুম
চান্দে আইয়্যা পড়ে।
গূঢ় সিংহনাদ বাজে
গহীন মনেরে।

মাখন, নন্দ, রাধাচরণ দাওয়ায় বসে তামাসা দেখে। গানের সুরে নিজেরাও গুনগুনিয়ে সুর ধরে। । পাতিল ভাঙার পর শুরু হয় নবান্ন খাওয়ার আয়োজন। কিন্তু মাখন ঠাকুর সব উপভোগ করলেও খাওয়া নিষেধ। ছোটলোকের রান্না খেলে পাছে লোকে কিছু বলে। খেতে বসে সুমিত্রার মুখ দিয়ে গ্রাস ঢুকতে চায় না।

মাখন ঠাকুরের মুখটা করুণ হয়ে কেন জানি মনে ভাসে।

পর পর দু বছর বন্যা। মাঠে ফসলের কোন চিহ্ন নেই। বাজার হাটে চালের আকাল। তিন টাকা মনের চাল হঠাৎ শ্রাবণ ভাদ্র দু'মাসে ষাট টাকা সত্তর টাকায় পৌছে। যজমানদের অবস্থা বড় শোচনীয়। খুদ কুঁড়া

ফেন একমাত্র সম্বল। মোটামুটি বছরের খোরাক পায়। যে তার ঘরেও মিষ্টি আলু কিনে চিকন করে কেটে এক মুঠো চাল মিশিয়ে সেদ্ধ করে খায়।

নদীয়া দাস সারা বছরের খোরাক পেয়েও বছর বছর মন ত্রিশেক ধান বেচতে পারে। এই আকালে তার ঘরেও বীজ ধান নেই। নদীয়ার বৌ বিলে গিয়ে সাপলা খোঁজে। সাপলাও প্রায় শেষ। শিকড় বাকড় উপড়ে এনে সেদ্ধ করে খায়। বিল খালে গাঙ-কলারও আকাল। গ্রামের চারদিকে সাজনা পাতা, বগী পাটের পাতার কোন চিহ্ন নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ খিদের জালায় পাতা তুলে সেদ্ধ খায়।

তার ওপর তুফান হলো দুবার। গাছ গাছালি কলাগাছ সব ভেঙ্গে তছনছ। কেউ কচি কলা-পাতা চিবিয়ে খিদে মেটায়। ডিমাই শাক, লাউপাতা খেতে খেতে কারো পেটে শক্ত বেরাম ধরে। মানুষও মরে। ওষুধ পথ্যের খবর নেই। থাকলেও ওষুধ কেনার সঙ্গতি কার আছে। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরের কুসুম এম. বি নন্দলাল এম বি তখন ভরসা। কিন্তু যাওয়ার সামর্থ্য কই।

ভেটের চাল, মানে সাপলা গোটার চালও তখন পাওয়া মুস্কিল। তবুও খুঁজে খুঁজে খায় কেউ। নন্দ দাসের বিরাট বাড়ী, লোকজন অসংখ্য। বিরাট কডাই উনুনে চাপিয়ে ধানের কুড়া সেদ্ধ করে। মেরা পিঠা বানিয়ে খায়।

সেদ্ধ করার লাকড়ি পাবে কোথায়। চারদিকে জল আর জল। কেউ ঘরের বেড়া ভাঙ্গে, কেউ ঘরের চালের রোয়া-খাপ খসিয়ে উনুন ধরায়। কচু বনে কচু নেই। একেবারে সাফ। কচু সেদ্ধ খেয়ে খেয়ে অতিষ্ঠ হচ্ছে সবাই। সেদ্ধ বলতে সেদ্ধই। কারো ঘরে লবন নেই। বাজারে আছে। তবে দাম, প্রতি সের আঠারো টাকা। তাও আবার সস্তা দামের লবনের রঙের মতো সার মেশানো। অসুখ বিসুখ ব্যাধি মানুষের দেহে বাসা বাঁধার মতো সব আয়োজন শুরু।

ঘরের ভিতরে জল কমে না। স্যাঁতসেতে অবস্থা। কারো ঘরে হাঁটু সমান জল। মাছ ঢোকে। মাছ খেতে সাপও ঢোকে। বিছানা থেকে চল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মাছ মারে। আলুনি মাছই কারো সম্বল। যাত্রামোহন দাসের ঘরেও জল। ঘুমন্ত বাচ্চাটি কখন জলে পড়ে লায়। মাছ ভেবে চল দিয়ে ঘাই মারে। বাচ্চা মারা যায় অমনি।

ডেকচি সহ ভাত চুরি তখন প্রতি পাড়ায় ঘটনা। ধরা পড়ে কেউ। পড়লে খিদের জ্বালায় মরার আগে মারপিটেই মরে। ঘরে ঘরে মানুষ মরে। পোড়ানোর লোক নেই। দুজন পুড়ে এলে গ্রামে দেখে আরো পাঁচজন মারা গেছে। দাহ করার লাকড়ি কোথায়। জলের মধ্যেই ভাসিয়ে দেয়। কাক চিল শকুনেরা ঠোকরাতে ঠোকরাতে কিম্ভুত কিমাকার করে ফেলে মনুষ্য দেহ-গুলো। ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাংস নাড়ীভুড়ি জলে পচে। দুর্গন্ধ বেরোয়। যেদিকে চোখ পড়ে শুধু মৃতদেহ ভাসে।

সমাজেও তখন নিয়ম কানুন ভেঙ্গে গেছে। পরান দাস অনাহারে অচল। বিছানায় লেপ্টে থাকে। যুবতী মেয়ে গিরিবালা যায় রমেশ মহাজনের ঘরে। সোয়াসের চালের বিনিময়ে মেয়েটির ওপর চলে রাতভর ধর্ষণ। অভিযোগ করার কেউ নেই। থাকলেও বিচার করবে কে।

খিদের জ্বালায় সুন্দরী দাস টিকতে পারে না। ছুটে যায় ইসলামপুরে মন্নাফ মিঞার ঘরে। পেটে ভাতে থাকতে থাকতে মন্নাফের ঘরেই পেটে বাচ্চা ধরে। চারদিকে খাবার খাবার একটা হাহাকার।

কালিচরণ গেছে নাজিরা'বাড়ীর মোল্লার ঘরে কাজ করতে। কোনরকম দুর্ভিক্ষটা কাটিয়ে দেয়। অভাব শেষ হলে ফিরেও আসে। জাতে তখন তার প্রবেশ নিষেধ। কলমা পড়ে কালিচরণ দাস তখন কালিচরণ মুন্সী হয়ে গেলো।

আশুগঞ্জের সরকারী গুদামের চাল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার গুদামের চাল বোঝাই হয়ে জাহাজ ছুটে মেঘনার বুকে ঢালতে। কেমন পৃথিবী কে জানে।

তখন মহাজনদের পোয়াবারো। সস্তায় জমি কেনার হিড়িক পড়ে। কানি প্রতি বিশ টাকা ত্রিশ টাকা জমি বিকোয়। অন্যদিকে জমিদাররা লোক পাঠায় সৈন্যদলে মানুষ ভর্তি করতে। অভাবের তাড়নায় কেউ যায়। যুদ্ধে প্রাণ যাবে ভয়ে কেউ কেউ যায় না।

আকাশে থেকে থেকে যুদ্ধের বিমান ওড়ে। কোন দেশে যুদ্ধ। তিতাসের মানুষ মরে কেন কে জানে।

মাখন ঠাকুর অসহায়। চোখে অন্ধকার দেখে। দিকদিগন্ত জুড়ে খিদের

আগুন দাবানলের মতো দেশটাকে গ্রাস করে ফেলে। চাল, কাজ খুঁজে খুঁজে দেশ থেকে দেশে ঘোরে।

মাখনের বাবা তখন একেবারে অচল। একটা খড়কুটো পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে বাঁচার উপায় নেই। মাখনের মা শুনেছে হরিচরণের ঘরে নাকি রান্না হয়। ছুটে যায় সেখানে দুটো ভাতের আশায়।

হরিচরণ যেমন কৃপণ তেমনি তার মেজাজ কড়া। ত্রিপুরা পাশের পাহাড়ী দেশ। সেখানে যায় বেপার করতে। মটকা ভরে স্টুট্‌কি আর সিদল নিয়ে ভোর বেলায় ছোটে। চান্দুরা বাজার হয়ে বামুটিয়ার পথ ধরে আগরতলা রানীরবাজারে যায়। চাল ধান সেখানে সস্তা। কাঁঠাল তো প্রায় মাগনা পাওয়া যায় বললেই চলে। গভীর রাতে হাঁটতে হাঁটতে চলে, কাঁঠাল নিয়ে বাড়ী পৌছতো।

পৌছেই দেখে বাড়ীতে ভিড়। কেউ উঠোনের কোণে। কেউ বারান্দার পাশে। কেউ বা রান্নাঘরের আবর্জনার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। অধিকাংশই সধবা। জ্বলজ্বলে ক্ষুধার্ত চোখ রাতের অন্ধকারে ঝলসে ওঠে পেত্নীর মতো। সঙ্গে জীর্ণশীর্ণ লেংটা শিশু।

কাঁঠাল খেয়ে বাকল যখন গরুর গামলায় রাখতে যেতো, বাজপাখীর মতো ছোঁ মেরে নিয়ে যেতো। ঝগড়া বাধতো জানোয়ারের মতো। হারির মা যখন মাড়ের ভাতে মাড় ঢালতো, ইচ্ছে করেই ভাতের গোলা ছেড়ে দিতো। মাড় যখন বাইরে দিতে যায়, টিনের থালা নিয়ে এগিয়ে আসে সবাই, কাকে দেবে কাকে দেবে না। মাখনের মাও লজ্জা শরম বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো চুপি চুপি। টিনের থালায় কয়েক ফোঁটা মাড পড়তেই দৌড়ে ছুটতো। কি জানি কেউ যদি কেড়ে নিয়ে যায়। ওই কয়েক ফোটা মাড কত দুর্লভ, কত আনন্দের। শুকনো মুখগুলোতে আনন্দের ঝিলিক হানতো অদ্ভুত এক খুশীতে। ভাতের গন্ধে মানুষ এত পাগল হতে পারে ভাবা যায় না।

চুরিও হতো প্রচুর। কারো ঘরে চুরি হলে পরদিন ধরে ফেন খুঁজতে যাওয়া লোকদের। প্রচণ্ড মারের চোটে কেউ মারাও যেতো। নিজের খিদের জ্বালায় নিজের সন্তান সন্ততির প্রতি দরদও হারিয়ে যায় মানুষের। মানুষ তখন মানুষ নয়। কেউ কোলের সন্তান ধনীদের দরজায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতো।

গরু ছাগলও মরে অহরহ। তবুও দুঃখের সায়রে তিতাসের কোন মাঝি গান গায়—

মরায় জ্বালাইরে
ও স্বদেশ ভাই
সেই মরা লয়া
আমি কোন দেশেতে যাই।

সরকারী উদ্যোগে মেড্ডা গ্রামে লঙ্গরখানা খোলা হয়। খিচুরী রান্না হয় পঞ্চাশ জনের। লোকজন টিনের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, হাজার খানেক। এই নিষ্ঠুর প্রহসনে জর্জরিত মানুষ তবুও কেন জানি কথা বলে না। পাড়ায় পাড়ায় রাতভর হরি সংকীর্তন বসতো আগে। দুভিক্ষের ছায়া বিস্তার হলে কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না। শেয়াল কুকুরের কীর্তন সারা রাত বিভীষিকা সৃষ্টি করে রাখে।

মাখন ঠাকুর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে ভিক্ষে মাগে। কখনো সন্ন্যাস গায়, কখনো ভজন। গান ভালো লাগলে কেউ এক মুঠো দেয়। যাদের সঙ্গতি নেই তারা দেয় না। গান শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, চোখের জলে সহানুভূতি জানায়।

দেখনে দেখতে আসে আশ্বিন মাস। দুভিক্ষ কবলিত তিতাসের পাড়েও ঢাকের বাজনা বাজে। তিতাসের জলে পচা গলা মৃতদেহের ভেলার মিছিল ছোটে। তখনই অষ্ট গ্রামের যোগেশ দেব যাত্রাগানের পালা বানায়।

মিষ্টি গলা। লোক কাঁদাতে পারে মাখন। পেয়ে গেলো ছোকরা দলে নাচার সুযোগ। সিলেট থেকে বায়না পেয়েছে যাত্রাদল। সেখানে মাখন যায় যাত্রাদলে অভিনয় করতে। মাখন ঠাকুর মনসার পাট করে। নেচে নেচে গান গেয়ে দর্শকদের মন নাচায়। অষ্টমী পূজার দিন চন্দ্রধর পালা। সমসের নগর বাগানে। মঞ্চে উঠেই দেখতে পায় তার কাকা দর্শকদের ভিড়ে। সমস্ত কেরামতি দেখিয়ে অভিনয় করে। দর্শকদের দরদ ঢালা বাহবা কুড়ায়।

মঞ্চ থেকে নেমেই কাকাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে তার বাপ মারা গেছে। ম্যানেজার দুদিন আগেই জানত। তবুও জানায়নি পাছে বায়না নষ্ট হয়। দীপান্বিতা পর্যন্ত তার থাকার কথা ছিল। সামান্য কিছু টাকা নিয়ে দুঃসংবাদে মুষড়ে ছোটে রসুলপুরের দিকে।

অভাব কমতে থাকে। তবু আশ্বিনে দুর্ভিক্ষের রেশ কিছুটা আছে। তখনই এলো রূপচান দাস সোনাধনের ঘরে। কাঁধে চাদর, হাতে ছাতি, পরনে নতুন ধুতি দেখেই সোনাধন অনুমান করে লোকটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসছে। কিন্তু এত অভাব কাটতে না কাটতেই বিয়ে দেবে কেমন করে। সোনাধন তখন উঠোনে গাবের জল ডেকচিতে বসিয়ে সেদ্ধ করে। সুমিত্রা ঘাটে কাপড় কাচতে ব্যস্ত ছিল। আগন্তুককে দেখে কিছুটা অনুমান করলেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।

উঠোনে গিয়েই রূপচান ডাক ছাড়ে, সোনাধনবাই বাড়ী আছনি।

সোনাধন জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বলে, আয়েন আয়েন! কি মনে কইর‍্যা গরীবের বাড়ীতে আইছেন।

ঘর-দুয়ার তেমন গোছানো নয়। উঠানে ভাঙা ডুলা। বেড়াতে কাপড় মেলা। বাঁশের আরাইলে জাল টাঙানো রোদে। উঠোনে ধান সেদ্ধ করার উনুনে লাকড়ি ছড়ানো। এক কোণায় গোয়াল ঘরের পাশে বাছুর বাঁধা।

জল চৌকিতে বসেই অভাব কাটানোর গল্প বলে। নিজে কত কষ্ট পেয়েছে তাও বলে। আগামী বছর ঠাকুরের কৃপায় কেমন কাটবে। আরো অনেক কথা ছেড়ে মূল কথায় আসে, আইলাম বাই, তোমার মাইয়্যাটার একটা সম্বন্ধ লইয়া। পাত্রটার বাই অবস্থা বালা। জমিন আছে নাইলেও দোনের কাছাকাছি। খাওইন্যা নাই ঘরে। গেল ভাদ্র মাসে দুই কানি জমিন কিনছে। দেখতে খুব সুন্দর। তোমার মাইয়্যাটার লগে মানাইব ভাল। চিন্তা করলাম মাইয়্যাটা এই ঘরে গেলে সুখে থাকব। অন্তত ভাত কাপড়ের অভাব জীবনে কোনদিন অইত না। দোষের মধ্যে দোষ অইল বউটা মরছে দুইটা পোলা আর একটা মাইয়া রাইখ্যা। পনও আশা রাখি খারাপ পাইতা না। বিয়ার খরচ কুলায়াও টেকা পয়সা কম থাকতো না।

সোনাধন কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করে, পাত্রটা কেডা, বয়স কেমন।

—পাত্র অইল আমার নিজের শালা, বয়স চল্লিশের বেশী অইত না। চিন্তা-ভাবনা কইর‍্যা জানাও। শুভ কাম কইলাম এই মাসেই করন লাগব।

সোনাধন উত্তর দেয়নি। শুধু সম্মতি সূচক নীরবতা জানিয়ে দেয় মনের ইচ্ছা।

কাপড রোদে ছড়ানোর সময় ভাল করে সব কথা শোনে সুমিত্রা। বিয়ের কথা বিশ্বাস করতে পারে না। তবু বুকের ভেতরটা কেমন যেন চমকে ওঠে। থেকে

থেকে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ইচ্ছে হয় দৌড়ে গিয়ে আপত্তি জানাতে। সাহস হয় না। আর আপত্তি জানালেও শুনবে কে। ধন, দৌলত, পণ দিয়ে মেয়ে বেচাকেনার সংসারে কার ব্যথা কে বুঝবে। যে বোঝে সে এখন দূর দেশে। "মন বাইন্দ্যা রাখিস" বলে বাঘজোর বিলের খলায় কদিন কথা দিয়েছিল। সে কথা তাবিজের মতো বুকে বেঁধে রেখেছে। গোয়ালখলায় বিয়ে হলে ভাত কাপড়ের অভাব থাকবে না ঠিক। চিন পরিচয় নেই, এক পরপুরুষের কাছে নিজেকে সমর্পণ করবে ভাত কাপড়ের বিনিময়ে। ভাবতে সমস্ত গায়ে শিহরন জাগে। ব্রাহ্মণ ছেলেটা কত সহজ সরল। সিংরা লতার ফাঁকে বিলের অথৈ জলে অতীত শৈশবে খেলার ছলে যে ভালোবাসা অঙ্কুরিত হয়েছিল, আজকে বিশাল বৃক্ষের শিকড় হয়ে মনের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। ইচ্ছে করেই বিয়ের একটা প্রস্তাব শুনে উৎপাটিত করা যায় না।

মনের দিক দিগন্তে একটা ক্রোধ আর করুণ ব্যথা জমাট বাঁধছে। প্রকাশের পথ খুঁজে পায়না। দূরের আকাশে উড়ন্ত মেঘের মতো শুধু চোখের চাউনি কি যেন খুঁজে বেড়ায়। দিশেহারা পালভাঙা নৌকার মতো মন কোন দিকে ছোটে। বৈঠা ধরে পারের কিনারা করতে পারে না। অকূল দরিয়ার কিনারা সেই ঠাকুর। কোন দেশে সখীর নাচন নাচতে গেছে কে জানে। কাকে জিজ্ঞেস করবে তার ঠিকানা।

কোন একদিন ফিরে আসবে নৌকার পাল উড়িয়ে। ঘাটের পারে ভাটীয়ালী গান গাইবে। বাসন মাজার সময় কে আসবে তার ব্যাকুল বুকে একটু প্রেমের চাওয়া চাইতে। জাম্বুরা গাছের তলায় জোনাকীরা মিট মিটে আলো জেলে থাকবে। কে তখন সোহাগ করে আধো অন্ধকারে মরমী হাতের ছোয়ায় চুলের মাঝে বিলি কাটবে।

ভাবতে ভাবতে বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি লাগে। কেমন উদ্বেগে মন স্থির রাখতে পারে না। পথ চেয়ে বসে থাকে দূরে ভাসমান নৌকার দিকে অধীর আগ্রহ নিয়ে।

বিয়ের কথা যেদিন থেকে শোনে, সেদিন থেকেই কেমন যেন আনমনা। চুল বাঁধে না। লোকের সাথে কথাও বলে না। পাড়ার বান্ধবীরা ডাকতে এলে। শুয়ে থাকে বিছানায় ঠিক যেন গাছ থেকে খসে মাটিতে নোতিয়ে থাকা লতা।

মা যখন দশবার ডাকে বড় অনিচ্ছায় একটা জবাব দেয়। স্নানের ঘাটে গেলে ঘাটেই থাকে ফিরবার কথা মনে থাকে না। বাসন মাজতে গেলে বাসন ঘসতেই থাকে। ধান সেদ্ধ যখন দেয়, আগুন নিভে গেছে তবু লাকড়ী ঠেলে। সব সময় কিসের এত তন্ময়তা। জলের ঘাটে গেলে হারানো দিনের সিংরা খোঁজা স্মৃতি জীবন্ত হয়ে আসে। কখনো বাঘজোড় বিলের খলার শ্যাম বিনো-দিয়া গান মনটাকে খামচে ধরে।

দূর থেকে কেউ যদি ভাটিয়ালী গানেরসুর তোলে, মনে হয় মাখন ঠাকুর বুঝি আসছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ভুল ভাঙে। বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা দারুণ ব্যথা লাগে। দূর থেকে দূরে ডিঙ্গি নৌকা পাল উড়িয়ে যায়। বালিহাসের ঝাঁক দূর থেকে দূরে আকাশে মিলায়। মনে হয় বালিহাস হয়ে কেন জন্মালো না। ডানা মেলে উড়ে উড়ে যেতো দূর দেশে যেখানে মাখন ঠাকুরের সুর বাতাসে ভাসে।

গ্রামের কেউ বলে মেয়েটাকে ভূতে ধরেছে, কেউ বলে শত্রুতা করে তাবিজ করেছে। যারা জানে তারাই শুধু বলে পিরিত রোগের জ্বালায় জ্বলছে।

দেখতে দেখতে বিয়ের সানাই বাজে। আত্মীয়স্বজন এসে বাড়ী গমগম। পণের টাকায় বাড়ী জুড়ে অভাবের কোন চিহ্ন নেই। মেয়েরা বসে পানের বাটা ভরে সাজায়। কেউ বিয়ের শাড়ী কাপড়ে মেলে পরখ করে। কেউ ব্যস্ত ধানদুর্বা ঘট সাজানোর আয়োজন করতো। কেউ আবার বিকেল থেকেই উনুনে ঢোকে। কয়েকজন আবার মশলা বাটতে গিয়ে গল্প তোলে, জামাই কইলাম দেখতে খুব সুন্দর অইলেও বয়স কোন কমনা।

পুরুষেরা কলার পাতা কাটায় ব্যস্ত। কেউ আবার দুমদাম লাকড়ী কাটে। নন্দ বন্ধুদের দিয়ে উঠোনে বিয়ের কুঞ্জে কলা গাছ পোতে। কেউ আবার পাড়া ঘুরে ঘুরে চাটাই, ডেকচি, কড়াই খোঁজে।

দেখতে দেখতে গোয়ালখলা বরের দল এলো নৌকায়। সঙ্গে পচিশ ত্রিশ জন লোক। মাথায় মুকুট পরে বর নামে। পাশে হ্যাজাক বাতি ধরে বরকে দেখায়। উলুধ্বনি ওঠে সোনাধনের বাড়ী জুড়ে। বিয়ের পিড়িতে বসে জামাই। কনেকে নিয়ে হাতে হাত বাঁধা হলো। এবার শুরু সাত পাকে বাঁধার পালা। কনের বাড়ীর আত্মীয়কুটুমরা কনের পিড়ি তুলে বরের চারদিকে ঘুরায়, কনে

তখন ফুল ছিটায়। বরকে তুলে রাখে বরের কুটুমরা। দল বেধেমেয়েরা গায়, বাজনার সাথে সাথে—

ধিক ধিক আমার এ জীবনে
ও সই প্রাণনাথ বিহনে
ও সই প্রাণনাথ বিহনে
ও সই স্বজন বন্ধু আসিল না কেন
কোন দুঃখ দেয় নাই বন্ধুর সরল প্রাণে
ওগো তবু কেন ভুলে রইল।

সুমিত্রার বুকে তখন দহন জ্বালা। প্রাণনাথ দূর দেশে এক মুঠ ভাতের খোঁজে ঘুর ছে। স্বজন বন্ধু আসবে কেমন করে। যাত্রা পালায় মনসা পাট নিয়ে চাদ সদাগরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবায়। নিজের অজান্তে এতদিনের জমানো মনের ধন ডুবছে কোন গাঙে সেই কথা কি মাখন ঠাকুর জানে। ওই বিয়ের গানে অবলাপ্রাণ বিকল করে। হাতে হাতে বাঁধা নয় এ যেন লোহার বেড়ী পড়া। নিজেকে নিজে বলে গাঙের ঘাটে গলায় কলস বেঁধে কেন সে মারলো না।

মালা বদল করতে গিয়ে আধবোজা চোখে মেলে তাকায়। তাকাতেই যেন পায়ে শিহরণ জাগে। গাল তুবড়ানো বর। বয়স একবারে বাপের সমান না হলেও খুব একটা কম নয়। বরের কিন্তু কুচকানো চামড়া ভাজ তুলে চোখ দুটিতে খুশির ঝিলিক মারে। কেশহীন রক্তের ধারায় কপালের শিরাগুলো ভাসমান। মাথায় মুকুট, টাক আছে না পাটের মতো চুল বোঝা যায় না। আতঙ্কভরা কৌতূহলে সুমিত্রার মনে উদ্বেগ জাগে।

মাখন ফিরে দেখে গ্রামটা অনেক বদলে গেছে। চেনা চেনা মুখ অচেনা লাগে। প্রায় মানুষের গায়ের রঙ রক্তশূন্য ফ্যাকাশে। অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও দীর্ঘ অনাহারের ধারা তখনো পুরোপুরি কাটেনি। যুবকদের কোটরাগত চোখের কোলে দুঃখী দুঃখী ছাপ। যৌবন তাদের বাসী ফুলের মতো ঝিমানো। চিনা পরিচয় মানুষদের খবরাখবর নেয় মাখন। কেউ আছে, কেউ নেই। রূপকথার রাক্ষসীর পেটে যাওয়ার মতো গোটা গ্রামের চেহারা। দুর্ভিক্ষের নখের আচড়ে ক্ষত বিক্ষত দেশ। বেড়া ভাঙা ঘরদুয়ার। কারো ঘরের চালা একবারে নেংটা। আচ্ছাদনহীন রোয়াক, বাঁশ পাজরের মতো বেরিয়ে আছে।

কোন ঘর ছন্নছাড়া। মানুষজন নেই। ভিটের মাটিতে ঘাস গজানো। অভাবের সময় যে যেদিকে পারে পালিয়ে গেছে ভাতের খোঁজে। এখনো ফেরেনি। কালাচান দাস তিনটে ছেলেমেয়ে মরার পর নিখোঁজ। কোথায় গেছে কেউ জানে না। এমনিতে ছিল রাতকানা। রশি পাকিয়ে বিক্রি করে সংসার চালাতো। জয়চরণ একতারা বাজিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরতো বাউল গান গেয়ে। পথের পাশেই খেতে না পেয়ে মারা গেছে।

বটগাছের তলায় কীর্তন গাইতো আনন্দ সাধু। আনন্দ সাধুর গান শুনে বিধবা, বুড়োরা ঘরে থাকতে পারতো না। লোকটা নাকি ঘরের ভেতর উপোসের যন্ত্রণায় মরে। মরার দুদিন কেউ খবর পায়নি। দুর্গন্ধ বেরোলে গ্রামের লোকরা গিয়ে দেখে। মরার মুখের কাছে পচা ভাতের থালা। এক গ্রাস কি দু গ্রাস খেয়েছে কি না কে জানে। এখনো অবশ্য বটের তলায় কেউ কেউ কীর্তন গায়। লোকে বলে, আফশোস করে আনন্দ ছাড়া কীর্তনে আনন্দ আইব কেমনে দা—

মাখনের বাপ বসন্ত ঠাকুরও মারা গেছে অনাহারেই। উপোসে থাকতে থাকতে দেহ তখন দুর্বল। মাখনের মা কোনরকম দশ গ্রাম ঘুরে অনেক রাতে চাল যোগাড় করে। বসন্ত ঠাকুরের আবার সর্দি কাশি। ঘন ঘন হাঁচি উঠতো। রাত দুপুরে মাখনের মা উনুন ধরায়। বসন্ত ঠাকুর খিদের জ্বালা সহ্য করতে পারেনি। মুঠো মুঠো কাঁচা চাল চিবোতে আরম্ভ করে এমন সময় হাঁচি ওঠে। গলায় আটকে গিয়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরে।

অভাব থাকলেও বাড়ীর কর্তা একজন ছিল। ভালমন্দ দেখতো বলতো। মাখনের বাপ হারিয়ে গাছকাটা ডালের বাসাভাঙা পাখীর অবস্থা। শাসন, ধমক দেওয়ার কেউ নেই। একটা শূন্যতা বাড়ীজুড়ে ঘুরে ফেরে। মাখনের মার অবস্থা কাহিল। হতভম্বের মতো আধপাকা চুল ছেড়ে গালে হাত দিয়ে বারান্দায় বসে। কখনো বসন্ত ঠাকুরের জলচৌকি থেকে, ধর্মের বই নাড়াচাড়া করে বিলাপে বুক ফাটিয়ে কাঁদে। নিরিবিলি ঘরটায় বুড়ো যেন হঠাৎ খিটখিটে মেজাজে ধমক দেবে এমনি এক সতর্কতায় মাখন থাকে। অভ্যাসের তাড়নায় সতর্ক হয়ে থাকলেও কেউ যখন কিছু বলে না, মনটা এক দুঃখানো ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

শোকের জ্বালা যখন জ্বলে অন্য এক জ্বালা এসে বুকে আগুন ধরায়। ঘরে বাইরে অশান্তি। ঘর থেকে বেরোলেই এক অসীম শূন্যতা চারদিক থেকে জাপটে ধরে। মনের মানুষ খোঁজে। কোথায় গেলে পাব মনের মানুষ। বুকের পিঞ্জরা খালি করে পাখী গেছে উড়ে। অন্তরে বাহিরে শেকল ছেঁড়া পাখীর খোঁজে দিশেহারা। হতাশায় বুকের ভেতর মোচড়ায়। কি যেন একটা বুক ঠেলে গলায় এসে আটকায়। পাখীর খোঁজে ক্লান্ত চোখের উঠোন বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গুনগুনিয়ে মাখন গায়—

সোনার ময়না পাখীরে আমার
সোনার ময়না পাখী।
কোন দ্যাশেতে গেলাই উইড্যারে
আমায় দিয়া ফাঁকি।
মন দিলাম প্রাণ দিলামরে
আর কি রইল বাকী।

গান মনে আসলেও গাইতে পারে না। আবেগে জড়িয়ে থাকে। কতোদিন বাইরে থেকে থেকে সুমিত্রাকে দেখার জন্য মন আকুলি বিকুলি করে। করলে কি হবে দেখা এখন সহজ নয়। কোনদিন যদি দেখাও হয়, পুরানো দিনের মতো কি মন খুলে কথা বলা যাবে! তবু ভাবে একবার গিয়ে আসবে ওদের বাড়ী। গেলে লাজুক লাজুক চোখ তুলে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকা তো আর কোনদিন পাবে না। ঘন ঘন কে আসবে বাসন মাজার অছিলায়! অনেক ভেবে গেল ওদের বাড়ীর পাশের পথ দিয়ে। সুমিত্রাদের বাড়ীতে ঢোকার পথে দুটো কলাগাছ পোঁতা। সবুজ রঙ নেই। ছেঁড়া ফেড়া শুকনো পাতা বাতাসে কাপে বিবর্ণ ভালোবাসার রঙ নিয়ে। সুমিত্রার বিয়ের দিনের কলাগাছ এমনভাবে উপহাস করবে জানা ছিল না। বিকেলের রোদ তখন মুছে যায় যায় অবস্থা। উঠোনের কোণায় আতপ চালের গুড়ি গুলিয়ে আকা আল্পনা। এতদিন পরেও বহু মানুষের পায়ের ধকল নিয়ে কোন রকম আছে। আল্পনা ম্লান আচড় দেখে ভাবে। ওই আল্পনার ওপর দিয়ে আলতা মাখা পা দুটো ফেলে ফেলে কত ব্যথায় জানি চলে গেছে সুমিত্রা। বিয়ের আসরে ঘোমটা টেনে যখন মালা বদল করে, একবারও কি মাখন ঠাকুরের শুকনো

মুখটা উঁকি দেয়নি মনে। সুমিত্রা যদি সত্যি সত্যি চিনে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই চোখের কোণে চিক চিক করবেই।

পথে যেতে যেতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। ওদের বাড়ীর কোণায় জাম্বুরা গাছের পাতা যেন ফিস ফিসিয়ে কথা কয়। মনে মনে বলে যে যাই কওক, জাম্বুরা গাছ তুমি তো হগগলতা জানো। ক্যারে চুপ কইর‍্যা রইছ। রাতভর রাস্তায় পায়চারী করে মাখন। বিলের বুকে গাঙের ঢেউ ছুঁয়ে আসে কোন এক মাঝির নিশুতি রাতের গান। মরমে বড ব্যথা জাগায়। বিচ্ছেদ ভরা গান শুনে ভাবে—সুমিত্রা কোন পুরুষের বক্ষে ডুব দিয়ে আপন মানুষ পর কবেছো কে জানে।

দেশে যখন আকাল। কে ধার ধারে পূজা-অর্চনার। মাখনের অবস্থা শোচনীয়। কোনরকম বাপের শ্রাদ্ধের-কর্ম-ক্রিয়া শেষ করেছে। কাজকর্ম নেই। বাঁচার উপায় ভিক্ষে করা ছাড়া অন্য কিছু দেখে না। কার্তিক মাসে গ্রামের কেউ কেউ হাল চষে রবি ফসলের জমি বানায়। ইচ্ছে হয় হাল চাষ করতে। কিন্তু ব্রাহ্মণ মানুষ শত অভাব থাকলে লালও ধরতে পাবে না। যদি ধরে সমাজ সেটা বরদাস্ত কববে না।

অনেক ভেবে চিন্তে ঘর থেকে বেরোয় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। গলা যখন মিষ্টি, গান গেয়ে পেট চালানো কঠিন হবে না। ভজন, সন্ন্যাস গান, বিচ্ছেদ-গান, আর কীর্তনেব গানই পুজি। ভিক্ষে তখন সাধারণ ঘটনা। অভাবের তাডনায় তখন অনেকেই ভিক্ষে করে। মাখন ঠাকুর ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে গ্রামে গ্রামে বেডায়। যতো চলে ততো ঝুলিতে পড়ে। আজকে যদি বাকাইল যায় একমাস সেদিকে মুখ ফেরায় না। কোনদিন কুচুনি, বুঢ্ঢা, বরুণকান্দি। কোনদিন সাডির পাড়া। কখনো দত্তখলা, সব গ্রামেই যায়। নিজের গ্রামে ভিক্ষে করে না। একতারা নিয়ে বেরোয়, কাঁধে ঝুলি ঝুলিয়ে। রাতের শেষ তারাগুলো আকাশে ফিকে হয়ে আসে। কখনো শিশিরভেজা মাঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোণাকুনি ছোটে।

গ্রামে ঢুকেই গলা ছেড়ে গায়।

ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ
লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।

যে জন ভজে গৌরাঙ্গের নাম
সে যে আমার প্রাণ রে।

যেখানে যায়, ঠাকুর মানুষ কাঁদায়। প্রাণভরে ঠাকুরকে দেয়। যারা দিতে পারে না তারা শুধু কাঁদে। গান শোনে কাঁদে না শুধু, কেউ ভাবে বসন্ত ঠাকুরেব ছেলে শেষ পর্যন্ত ঝুলি নিয়ে বুঝি বেরোল। কেন দেশের হাল এমন হলো, বলে কাঁদে। মাখন উদাস, বাধা-বাঁধন হারা। কে কি ভাবে ভাবার দরকার নেই। গান শোনে, ভালো লাগে কিছু দিয়ো। ভালো না লাগে দিয়ো না। এমনি এক নির্বিকার চলায় চলে। গ্রাম থেকে গ্রামে ঘোরে। মন বলে চলো একদিন গোয়ালথলা ভিখ মাগতে যাই। মনের আরেক দিক বলে এত গ্রাম থাকতে গোয়ালথলা কেন? সুমিত্রা আছে বলে যাওয়া? বেচারী সুখে আছে, থাকুক। অযথা গিয়ে বিড়ম্বনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবু যেতে ইচ্ছে করে। ঘোমটা টেনে কোনদিন যদি ভিখ দিতে আসে একবার হলেও তার মুখটা তো দেখা যাবে। কতদিন ধরে দেখা হয়নি।

অবিরত দ্বিধা দ্বন্দ্বে মন ভারাক্রান্ত। সুমিত্রা নামটা দূরে থাক, গোয়ালথলা শব্দটা শুনলেই চমকে ওঠে। কি রহস্যময় ওই গোয়ালথলা। কার ঘরের ঘরণী হয়ে উঠোনে ধান সেদ্ধ করে। শাঁখাপরা কোমল হাতে কার কাপড় কাচে। মাখন যদি উপোসের জ্বালায় দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে, সে দৃশ্য দেখেও কি ধনীর বউ হয়ে থালাভরে মাছ মাংস খেতে পারবে। একবার কি মুখের গ্রাস খসে পড়বে না। কত নিঠুর হয়েছে দেখেই আসি।

মাখন গেলো গোয়ালথলা। তখন দুপুর। গ্রামটি অনেক বড। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ঘরে ঘরে ঢুকে যেতে দিনের অর্ধেক লাগবে। এর মধ্যে যদি সাক্ষাৎ হয় হবে। না হয় আরেকদিন লাগবে। আর যদি ইত্যবসরে শ্বশুর বাড়ীর কোন আত্মীয় বাড়ীতে গিয়ে থাকে তাহলে সব বিফলে যাবে। বাড়ী সঠিক চেনে না। জিজ্ঞেস করতেও মুখে আটকায়। কেউ কিছু ভাবতে পারে। মাখন গোয়ালথলাতে ঢুকতেই গ্রামে সাড়া জাগে। বিশেষ করে মেয়েরা তার গান শোনার জন্য উদগ্রীব। এক বাড়ীতে গেলে বাড়ীর বউ, ঝিরা ভিড় জমায়। কেউ বলে,—ঠাকুর একটা সন্ন্যাস গান গাইন, কেউ বলে, বিচ্ছেদের গান জানলে একটা শোনান।

যেতে যেতে একটা টিনের বাড়ীতে ওঠে। বাড়ীর নমুনা দেখে বোঝা যায় সম্পন্ন পরিবার। বাড়ীতে বিরাট গোয়াল ঘর। কত গরু আছে কে জানে। উঠোনের কোণায় কয়েকজন মেয়েলোক একসাথে গাইল চিয়ায় ধান কুটে। কেউ ডালা দিয়ে ধান ঝাড়ে। ব্যস্ত বাড়ী। উঠোনে গিয়েই প্রাণ ঢেলে গলা ছাড়ে মাখন—

অনাথের নাথ গৌরারে
তুই আমারে পাগল করলি রে গৌরা।
দয়া না করিলে
অনাথেরে দিয়া কোল
আমায় সায়রে ভাসাইলি রে
সমুদ্রের ফেনা হইয়া রে গৌরা
ঘুরি ঘুরি বাঁকে বাঁকে
আমার বাইও নাই
বান্ধবও নাই রে
ডেকে জিজ্ঞাস করে।

ভিড় জমে চারদিকে। এর মধ্যে ঘোমটা টানা এক বউ। মুখ দেখা যায় না। ঠোঁটের ফাঁকে আঁচল চিবিয়ে দাঁড়ায়। দরজার আড়ালে থেকে শুধু মুখটা বাইরে থেকে দেখা যায়। ছল ছল ডাগর চোখ দুটি। কথা বলে না। শুধু চোখ দেখেই মাখন তাকে চেনে। শৈশবে শালুক খুঁজতে যাওয়ার বয়েস থেকে দেখা চোখ। ভুল হতে পারে না। কপাটে রাখা হাতে সোনার ঝলমলে চুড়ি। চুড়ি দেখে ঠাকুর ভাবে—সোনা-রূপার ঝলমলানির সুখে আপন যদি পর হয়। কিসের এত রঙ তামাসার ভালোবাসা। যাক পরের বউ। ইচ্ছে খুসী চলবে। তার কেন মাথা ব্যথা। কোনদিন বলার অধিকার ছিল। যেদিন ছিল সেদিন। সেই অধিকারের দোহাই দিয়ে এখন কিছু বলতে গেলে গোয়াল ঘরে বেঁধে রাখবে।

এত কথা ভাবনার পরেও মনে হয় মাখনের, ওই ছল ছল ডাগর চোখের গভীরে কত না-বলা কথা যন্ত্রণায় ধুঁকছে।

ঠাকুর যখন গান শেষ করে ভিক্ষের ঝুলির মুখ খুলে এগিয়ে দেয়, সুমিত্রা

ছুটে আসে অবিশ্বাস্য ভাবে। ঠাকুরের হাত ধরে টেনে বলে, থও তোমার ভিক্ষার ঝুলনা। তুই একটা আলাপ আছে। কয়দিন ধইর‍্যা খাইছ না কে জানে। ভাত বাইড়্যা, পেট ভইর‍্যা খাইয়্যা যাও। চাইয়ো আবার ছোট জাত দেইখ্যা ঘিন্না কইর‍্য না।

সুমিত্রা হাতের মুঠিতে ঠাকুরের হাত ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতব নেয়। সুমিত্রার দরদমাখা আব্দারে ঠাকুর হার মানে। এত সহজ ভাবে ঠাকুরকে আপন করে নিতে পারবে ঠাকুরের ধারণা ছিল না।

কাসার থালে ঠাকুর বসে খেতে। সুমিত্রা কাছে দাঁড়িযে খাওয়ায়। ঠাকুব চোখে তাকায় না, মনে ভাবে পাছে যদি কুচিন্তা আসে! আরেকজনের সোনাব সংসারে আগুণ ধরিয়ে লাভ নেই। এর চেয়ে ভালো নিজের যাতনা নিয়ে নিজেই চলি। ওর মঙ্গল চেয়েই থাকি তাহলে ওকে শান্তিতে থাকতে দিলেই শান্তি।

এমন সময় এক প্রৌঢ় এসে ঢুকে ঘরে। বলে, অতিথি অইল নারায়ণ। কি খাওয়ামু কন। কোনরকম জল বাত খাইয়্যা যাইবেন।

বুঝিয়ে দিলেন তিনিই বাড়ীর কর্তা। সুমিত্রার ঘরের মানুষ। নিজে তামাক সাজিয়ে হুঁকো টানতে টানতে বুড়ো বাইরে যখন যায় তখনই ঢোকে খিটখিটে এক বুড়ী। ঢুকেই বলে, হুনছনি বৌ, বাওনের পুতরে যে খাওয়াইতেছ মানষে কি কইব। এই পাপটা নিব কেডা। পাইয়া পরের ধন বাপেপুতে কীর্তন।

সুমিত্রা প্রায় রেগে বলে, পাপ নিলে আমি নিমু, তোমাব অত কুটনামি কইর‍্যা লাভ কি। তোমার কামে তুমি যাও। কেউ এক বেলা খাইলে, তোমাব অত জ্বলে কেরে। তোমার খায়নি কোন। সুমিত্রার স্বামী বাইবে থেকে বলে, খামাখা তুমি আবার দববার কর কেরে। বেটির মনে ধরেছে, খাওয়াইছে। ভ্যান ভ্যান কইর‍্যা লাভ কী। বাওনের পুতের কি পেট নাই।

বুড়ী চটে জবাব দেয়, মানষের সামনে তোমায বউটা যে কি কয় শাসন করনা কেরে। বড় বইন তুইদিন আইছি নায়র হেইডা সহ্য অয়না তোমার। বুড়া বয়সে কম বয়েসী বউ পাইয়্যা বউএর কথায় নাচ। লাজ লাগে না। বউটা যে তোমারে আঁচলদা ঢাইক্যা রাখছে হেইটা কি আর বুঝ।

সুমিত্রা, তোমার বইন থাকলে কইলাম আমি আর থাকতাম না। মুখ সামলাইতে কও।

—দিদির কথা কইওনা, আম পাকলে মিঠা, মানুষ পাকলে তিতা। মানসে যে কয় হেইডা এমনেই কয়।

কথার ধারা কোনদিকে বইছে ঠাকুর বুঝে না। না বুঝলেও বউএর প্রতি স্বামী যে অনুগত বুঝতে কষ্ট হয় না। বুড়ী মুখরা ঠিক। বিদেশী অতিথির সামনে এমন ব্যবহার উচিত না। কিন্তু স্বামীটাও যেন নধর বউ পেয়ে কড়া কথা বলে না। কি জানি বুড়া বয়সে কচি বউ পেলে মানুষ কেন স্ত্রৈণ হয়।

ঠাকুর খেয়েদেয়ে পথ ধরে। সুমিত্রা কাছে এসে ঝুলনায় সের দু এক চাল দেয়। ঠাকুরকে ঘরের কোণে সবার আড়ালে জড়িয়ে ধরে বলে, একটু আদর কইর‍্যা যাও। বাওনের পুতমনডা লয়া গেছ। কি জ্বালায় জ্বইল্যা মরি। টের পাওনা। যাও। তবে কইলাম আবার আইবা।

সুমিত্রার এই লুকোচুরি খেলা দেখার জন্য আড়ি পেতে দরজার কিনারে লুকিয়ে ছিলো ননদ। ভাই বউ যে এইধরনের একটা কিছু করবে আগেই অনুমান করেছিল। তার শ্বশুর বাড়ীও রসুলপুরে। বিয়েটা হয় তারই স্বামী রূপচান দাসের দৌলতে। বিয়ের আগেই সুমিত্রা মাখনের সম্পর্ক নিয়ে চলে কানাঘুষা। ভেবেছিলো বিয়ের জল পডলে মতিগতি পাল্টাবে। কিন্তু কই, পরিবর্তন কিছুই দেখেনা। বরং দুদিনের জন্য নায়র এসে তাকেই অপমানিত হতে হলো। চাপা ক্ষোভ নিয়ে অপেক্ষা করতে করতে এই দৃশ্য যখন দেখে প্রায় চীৎকার করে ভাইকে, দেইখ্যা যারে মনবাই, তোর অতিথ নারায়ণের কাণ্ডটা দেইখ্যা যা। ছিনাল বেটীর রঙ তামাসা দেখ আয়া।

সুমিত্রার জামাই ভ্রূক্ষেপও করে না। নির্বিকার ভাবে হুকো টানতে টানতে জবাব দেয়, বেটী আইতের দরবার হুইন্যা লাভ নাই।

সুমিত্রার ননদ ভাইকে বিশ্বাস করাতে না পেরে আরো দ্বিগুন জ্বলে।

—মনাবাই, আগে তো এমন আছলানা। কি ওষুদ করচে বেটীয়ে, অখন বউ ছাড়া চোখে দেখনা। মইজ্যা রইছ বউ পায়া। বড় বইনের কথা অখন বিশ্বাস করবা কেরে।

ভাই তখন বলে, অত পের পেরি করিস না।

বড় বোন রাগে, ক্ষোভে অপমানে লাল হয়ে আসে। এই দুপুরবেলা পুটলা একটায় লাল পাড়ের শাড়ী, সেমিজ্জ বেধে কাউকে কিছু না বলে হন হনিয়ে

নিজের শ্বশুর বাড়ী যায়। রাগটা এতো বেশী। চুল বাধে বাড়ীর রাস্তার মুখে। ভেবেছিলো মনাবাই বুঝি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করবে। না কেউ এলো না।

পর দিনই বিচার জমায় রূপচান। উপেন ঠাকুর মাখনেরই কাকা। দেবোত্তর জমি নিয়ে পুরনো বিরোধ আছে মাখনের সঙ্গে। এই সুযোগে উপেন ঠাকুর তৎপর হয়ে ওঠে। নিজেই নৌকা পাঠিয়ে গ্রামের মাতব্বর মোড়লদের খবর জানায়। জাত বেজাত সবাই ভীড় জমায় অন্নদা ঠাকুরের উঠোনে। কৈবর্তের ব্রাহ্মণ, নমস্যুদের ব্রাহ্মণ অনেকেই আসে বিচার সভায়। নমস্যুদ আর কৈবর্ত মোড়লরা হাতে লাঠি নিয়ে ঢুকে। দণ্ডবত জানিয়ে সামনে বসে। লাঠি হাতে নিয়ে বিচারে আসা মোড়ল গিরির চিহ্ন। সভায় সভাপতির আসনে বসে মহিম ঠাকুর। মাখনকেও ডাকা হয়। মাখন এসে একটা কোণায় চুপচাপ বসে।

মহিম ঠাকুর জিজ্ঞেস করে, আইজকের বিচারটা কিয়ের লাইগ্যা ডাকছ কও। ভাবটা এমন তিনি কিছুই জানেন না। একেবারে নিরপেক্ষতার ভান করে মন দিয়ে শোনে।

রূপচান দাস প্রণাম জানিয়ে কড়জোরে বলে, দশজন অইল পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হগগলেই আইছেন। কইতে সরম লাগে, না কয়্যাও পারিনা। আমার বৌ গেছিল নায়র গোয়ালখলা। বসন্ত ঠাকুরের পুত হেইখানে গিয়া শালার বউ এর লগে যে কুকাম করছে দশজনের সামনে কয় কেমনে। বাওনের পুতে যদি ইতান করে আমরা যাইমু কই।

বিবাদীর বক্তব্য কেউ জিজ্ঞেস করলো না। মোড়লরা নিজেদের মধ্যে কানা-কানি করে অনেকক্ষন। পান তামাকও চলে এরই মধ্যে। দুজন তিনজন মাথা নীচু করে গূঢ় কোন রহস্য নিয়ে যুক্তি পরামর্শ চালায়। এক কোণায় যুবকদের দল। বাপ কাকারা সবাই আছে। মাথাটা কোনরকম অন্যদিকে ঘুরিয়ে তামাক টানে। কেউ আবার ভ্রূক্ষেপহীন ভাবেই তামাক টানে।

অনেকক্ষন পর বিবাদীকে কোন কিছু জিজ্ঞেস না করেই মহিম ঠাকুর গম্ভীর হয়ে বলে, এই সব হুন্যা, বিবাদীর কথা না জানলে অইব। মাখনরে একঘর করন ছাড়া উপায় নাই। আগুন পানি বাদ করতে অইব। তার হাতের জল দ্যা কেউ পূজা করতে পারত না, তে আগুন চাইলেও দেওন যাইত না।

সভা গুনগুনিয়ে ওঠে। অন্নদা পিণ্ডত অখিল সরকারকে বলে, জাত দিছে বাওন লয়া কি কামে লাগবে। বাওন অয়া নমস্থদ বাড়ী দাস বাড়ী খায়।

উপেন ঠাকুর কথার মধ্যে ঢুকে, হে খালি খায়নি। নমস্থদ কৈবর্ত মাইয়্যারার লগে থাকে, ঘুমায়। এইটার কোন জাত আছেনি। এই জাত দেওয়া লয়া সমাজে চলব কেউ। ঘরের আডালে মেয়ে লোকরা সব শোনে। কেউ আবার তামাক টানে।

মহেশ দাস কৈবর্ত মোডল বলে, কৈবর্ত বাডীর লগে বায়াপ বন্ধু আছে, চলে, ঘুমায় হেইটাও ঠিক। কিন্তু আকাম কুকাম করতে চোখে যখন দেখছিনা, কেমনে কয়।

নদীয়াবাসী দাস, বলে—আপনারা অইলেন সমাজের মাথা, বালা কোনডা বুডা কোনডা হাগলেই বুঝেন। আপনারার কথা ফালান যাইত না। দেখেন কোন বকম প্রায়শ্চিত কইর‍্যা টইর‍্যানি সমাজে লওন হায়। নাইলে গরীব মানুষ বাঁচব কেমনে।

এমন সময় যজ্ঞেশ্বর দাস কৈবর্ত মোডল তার ছেলে দাঁডিয়ে বলে, সভাপতি যদি অনুমতি দেন, তাইলে একটা কথা কইতাম চাই।

—'কও কও। মোডলবা প্রায় এক সাথেই বলে।

আপনারা দেশ থাইক্যা দশ থাইক্যা বাদ দিতেন পাবেন। আমরা কইলাম পাবতাম না। চলন লাগব তারে লইয়্যা। বিবাদীর কথা না হুন্যা বিচার অয় কেমনে, সাক্ষী ছাডা বিচার ত্রিভুবনে কোনদিন হুনছিনা। একজনের উপরে আরেকজন মিছা কথা কইলেই, আপনারা একটা রায় দিয়া লাইবেন। আপনারা এই রায়ডা বিবেচনা কইর‍্যা আবার দেখেন।

যজ্ঞেশ্বর মোডল উঠে হাতের লাঠি দিয়ে মাটিতে কয়েক ঘা মেরে বলে, তোরে ডাকছে কেডা ইখানো, আগাগুডি না বুইজ্যা কথাত ঢুকছে কেরে। সঙ্গে সঙ্গে অন্য যুবকরাও প্রতিবাদ করে।—ইডা কোন তালের বিচার।

মাখন উঠে দাডিয়ে বলে, মুরুব্বিরা কন! কইলে জাত যায়, না খাইলে জাত যায়। কৈবর্ত বাড়ীত খাইছি কয়া কাউরে কিছু করছি না। দশের পায়ে পইর‍্যা কয় প্রায়শ্চিত করুম কেমনে, আমি গরীব মানুষা। আমার কেউ নাই, মিছা কথা কইলে ঠাকুরে আমার বিচার করব।

কেউ শোনে না মাখনের বক্তব্য। যারা শোনে তারা বিচারে কেউ নন। দশ থেকে সমাজ চ্যুত হলো মাখন। কিন্তু যুবকরা হাল্যা দাস, কৈবর্ত, নমসুদ একসাথে পরের শনিবারেই শনি পুজো করে সাতটা আটটা বাড়ীতে। সব পুজার ঠাকুর হলো মাখন।

তখন আঘ্রাণ মাসের শেষ পৌষের শুরু। মাঠে মাঠে ধান কাটা শেষ। রসুলপুর থেকে ধান কারবারীরা ছুটে পাশের পাহাড়ী দেশ ত্রিপুরার দিকে। রসুলপুর, দত্তখলা, বরুনকাদন্দি সাডিব পার থেকে ভোর হতে না হতেই মাছের ভার নিয়ে ছুটো চান্দুরা বাজার হয়ে সীমান্তের গ্রাম বামুটীয়ায় ঢুকতো। হয় কেউ মোহনপুরে বাজারে না হয় রানীরবাজারে মাছ শুটকী বেচতো। বেচে রাত কাটাতো বামুটীয়ার সেখলী বাড়ী। মণিপুরীদের তখন মেখলী বলতো। লম্বা লম্বা বিরাট বাড়ী। বারান্দাও বড় বড়। বারান্দায় কোমর তাঁত পেতে মেয়েরা কাপড় বোনে। কপালে চন্দন তিলক কাটা। খোপায় রঙবেরঙের ফুল। উঠোনে ঝকঝক কাসার বাসন। বাড়ীগুলোর চারদিকে সুপারী গাছে ঘেরা। মোষ পালে বেশী। রাসের গান গায় মেয়েরা। একদিকে মাকু চলে হাতে মুখে তাদের ঢেউ খেলানো দীর্ঘ সুর। বাড়ীগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মাছ খায়। মাংস খায় না। হাস, মুরগি, ছাগল শুয়োর কেউ রাখে না। গ্রামের পাশে কারো আখ খেত। বড় বড় মহিষ নিয়ে আখের কলু ঘুরায়। মাছ বেপারীরা ভিড় করতো কলুর পাশে। প্রাণভরে আখের রস পান করতো। কোন কোন সময় নিজেরাই আখের খেতে ঢুকে আখ কেটে কলুতে ঢুকিয়ে রস নিঙরায়। আপত্তি করে না। দাম চাইতো না কেউ। আসতে যেতে মাছ বেপারীরাও একটা বড় মাছ দিয়ে দেয়। কয়েকটা শুটকী পেলে তারা কত খুশী। বামুটীয়া, রাঙ্গুটীয়া সোনাতলা, তারানগর, ফটিকছড়া মণীপুরী বাড়ীতে রাত কাটায়।

নিজের রান্না নিজেই করে দল বেঁধে। বাসন, কলার পাতা, চাল কোন কিছুর অভাব নেই। মাগনা পাওয়া যায়।

বিপদ শুধু ওদের শুচি বায়ু। বাঙালীর ছায়া লাগলে কাকালের জলের কলস অশুদ্ধ হয়। জল ফেলে জল আনে।

বোয়াল মাছ ভালোবাসে। কেউ তাদের ঠাট্টা করে পচাবোয়াল ডাকে।

এতে তাদের মনে লাগে। লাগলেও প্রকাশ করে না।

চিড়া মুড়িও ভাজে তারা। মুড়ির স্বাদ অপূর্ব। কোন কোন দুষ্ট বেপারীরা ছেলেমেয়ে ক্ষেপায়। ছড়া বলে—

মণিপুরি দাদি
চিড়া খাইয়া পাদি
চিড়া নাই ঘরে
মণিপুরী মরে।

ছেলেমেয়েরা ক্ষেপে লাল হয়ে ছড়া বলে নেচে নেচে।—

পেট মোটা বাঙ্গাল
পুটি মাছের কাঙ্গাল
পুটি নাই ঘরে
বাঙ্গালী পইড়া মরে।

ই এর উচ্চারণ ও হয়ে যায়। বেপারীরা খলখলিয়ে হাসে।

সকালে যায় দল বেঁধে ধান কিনতে। পাহাড়ীরা সহজ সরল। পোড়া নামক বাঁশের টুকরী দিয়ে ধান মাপে। উঠোনে মাচার ওপর ধানের গোলা। যে কিনে সেই মাপে। ধারেকাছে কেউ পাহারা দিয়েথাকে না। অবিশ্বাস বলে কোন কিছু আছে এটা তারা জানে না। লোভী ধান বেপারী যারা সুযোগ বুঝে চার পোয়া মাপতে ছয়পোয়া মাপে। মানুষ মানুষকে ঠকাতে পারে এটা যেমন অবিশ্বাস্য তেমনি বিস্ময়কর। কোন কোন ধান বেপারী আবার পাহাড়ীদের কাপাস, তূলা কিনে আনে।

কেউ আবার ধান বেপার ছেড়ে চুড়ি, চুলের পেটা, চিরুণী, পুতির মালা, রঙ বেরঙের প্লাসটিকের প্রজাপতি, সুবাসি তেল সাবানে ঝুড়ি ভরে ফেরী করতে যায়। ফিরে আসার সময় দুই পোয়া ধানের জিনিষ বেচে বার পোয়া ধান আনতে পারে। মেয়েরা ফেরীওয়াল দেখলেই ভিড জমায়। রূপার সিকি আধুলির মালা পরে বুক ঢেকে। টুং টাং মালা বাজে, যখন চুড়িওয়ালা কাচের চুড়ি পরায়। তাতেই ফেরিওয়ালার মন জুড়ায়। তিতাসের বেপারী তখন পাহাড়ে ভালোবাসার সওদা খোঁজে।

দেশে এসে বেপারীরা নানা রকম গল্প ছড়ায়। বাজার হাটে মাখন

সব শোনে।

রাতে ঘুম আসে না অনেক দিন ধরে। মাখনের মেসতুতো ভাই খবর পাঠিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে খোয়াই মহকুমাতে যাওয়ার জন্য। সেখানে একটা পাহাড়ী ইস্কুলে বেসরকারী একটা শিক্ষকের কাজ ঠিক করেছে। বেতন খুব বেশী না হলেও কোন রকম সংসার চালানো যাবে। তবু দ্বিধা যাবে কিনা যাবে।

দেশ বিভাগ হতে না হতেই চারদিকে হিড়িক পড়ে কার আগে কে পালাবে। দণ্ডখলার বড় মহালদার মহানন্দ মাল প্রতাপশালী লোক। কোন দিন মাথা নত করেনি কারো কাছে। সে-পর্যন্ত চলে গেছে আত্মীয়স্বজন নিয়ে। এখন ত্রিপুরারাজ্যে তেলিয়া মুড়ার পাশে মোহরছড়া গ্রামে বাড়ী করেছে। বাকাইল গ্রামের উমেশ চৌধুরীর ধনসম্পত্তি কোন কম না। সেও এখন আগরতলা রামনগরের বাসিন্দা। লালপুরের তরণী দাস, ক্ষিতীশ দাস বড় বড় মাতব্বর মুরুব্বী তারাও গেছে ত্রিপুরার কমলপুরে। গোয়ালখলার রাবণ দাস, ধনে জনে বিরাট পরিবার পাড়ি দিয়েছে তোলয়ামুড়ার কালীটিলায়। এই দেশ থেকে পাশের পাহাড়ী দেশে লোক ছুটছে হাজারে হাজারে নয়, বলা যায় লাখে লাখে।

কি ধন আছে ওই পাহাড়ঘেরা ছোট্ট রাজ্য জুড়ে। বাঁশবনে পাহাড়ের চূড়ায় গাছগাছালির কি দুরন্ত আহ্বান। মানুষকে ভুলিয়ে নেয়।

স্রোতে যখন বাঁধ ভাঙে কেউ আটকাতে পারে না। ভোর হলেই প্রতিদিন চৌদ্দ পুরুষের ভিটে মাটি, আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে শিশু, বৃদ্ধ, নারী, দলে দলে ছোটে। পাহাড় ভরে প্রকৃতির কলা বাগান। খাওয়ার কোন লোক নেই। গাছের কলা গাছেই পাকে। বানর, পাখীরা খায়। খেয়েও শেষ করতে পারে না। গাছের ডাল ভরে কাঁঠাল ঝোলে। পচে পচে ঝরে। কে খাবে এত কাঠাল। ঘর বানাবে, বাঁশ কাঠের অভাব নেব। বন পাহাড়ে সুন্দী, সেগুন, রঙ্গী, রাতা, চমল, জারুল, থরে থরে সাজানো। এখানে একটা লগীর বাঁশ খুঁজতে গেলে কত কষ্ট। ওই পাহাড়ী রাজ্যে বাঁশই কত জাতের। বরাক, মাকাল, দলু, রূপই, মিরতিঙ্গা, কালী বাঁশ, কাটা বাঁশ, মূলি বাঁশপাট খেতের মতো ঘন হয়ে আছে।

এক কানি জমির জন্য কত ঝগড়া-ঝাটি। ওখানে দুটো পাহাড়ের মাঝখানে

বিরাট বিরাট হাওর। ওইখানকার লোকে লুঙ্গা বলে। বুটাং গাছের বন, নল খাগড়ার বনে ঢাকা। জঙ্গল কেটে আবাদ করলে দ্রোন দ্রোন জমি বের হয় সোনার থালার মতো। বারো চাষ তেরো মৈ দিয়েও এখানে জমিতে ধান হয় না। ওখানে কোনরকম একটা চাষ দিয়ে, মাটির ডেলা ভাঙার জন্য একটা মৈ যেমন তেমন দিলেই হয়। কিছু ধান ছিটিয়ে দিলেই কাজ শেষ। কয়েক বছরের ফসল এক ফসলে আসে। তাছাড়া পাহাড় থেকে শিরা উপশিরার মতো অসংখ্য নদী, ছড়া তর তরিয়ে নীচের দিকে নামে। মাঠে মাঠে দৌড়তে দৌড়তে বড় নদীতে মেশে।

গরু, ছাগল, মোষ পালাও সহজ। ঘাসের কোন অভাব নেই। সারা বছর বনে পাহাড়ে চরে ভরে খেতে পারে। দুধ আছে প্রচুর। ওখানকার আদিবাসীরা দুধকে গরুর পুঁজ মনে করে। গাই দোহায় না কোনদিন। ইচ্ছে মতো দোহলে কেউ আপত্তিও করে না।

ওখানে গিয়ে রাজধানী আগরতলায় কলেজ আছে। সেই কলেজ টীলায় নাম লেখাতে পারলেই সব ঝামেলা চোকে। পরিবার প্রতি পাঁচ কানি জমি দেয়। তাছাড়া ঘর বানানোর টাকাতো আছেই। উপরন্তু পরিবার পিছু মুরগী, হাঁস, ছাগল, গরু বিনে পয়সায় জোটে। যতদিন এসব হবে না ততোদিন শিবির গড়ে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায়। এত সুখের দেশ কোথায় পাবে।

কেউ কেউ আবার ওই দেশে গিয়ে ফিরেও আসে। নানা রকম গল্প বলে। ওই দেশের পাহাড়ে ডাইনী ঘুরে বেড়ায়। মানুষ পেলে ঘাড় মটকে কোন জঙ্গলের কাটা বনে নিয়ে রাখবে কেউ জানে না। পাহাড়ীরাও তাবিজ কবচ জানে বলে থাকতে পারে। পাহাড়ীরাও নাকি মানুষ খায়। বছরের কোন একটা উৎসবের দিনে ঢোল বাজিয়ে পাহাড থেকে দল বেঁধে সমতলে নামে। ধারালো বল্লম আর টাককাল নিয়ে মানুষ শিকার করে। বল্লমের আগায় শিশুর মাথা গেঁথে নাচতে নাচতে আবার পাহাড়ে ওঠে। কোন কোন পাহাড়ী নাকি বাপের শ্রাদ্ধ করে মরা বাপের মাংস রেঁধে।

কেউ আবার বলে ওই রাজ্য জুড়ে কলা আছে প্রচুর। কিন্তু ওই কলা খেলে কালা জ্বর হয়। পেট ঢাকের মতো ফোলে। শরীর পাট-কাঠির মতো জীর্ণ হয়ে মারা যায়। একজন দুজন মরে না ঝাঁক ঝাঁক মানুষ মশা মাছির মতো মরে।

জঙ্গলে দিনের বেলা বাঘ এসে মানুষ মারে। কোথাও আবার বন মহিষের তাড়া খেয়ে নতুন বাঁধা গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়।

সেই শরনার্থী শিবির আরো ভয়ঙ্কর। মৃত্যু সেখানে লেগেই আছে। মাখন চান্দুরা বাজারে গিয়ে শোনে রাই দাস বৈষ্ণবীর গান। বৈষ্ণবী গিয়েছিলো কলেজ টীলার সেই শিবিরে। অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে এসেছে। চান্দুরা বাজারে ডুপকী বাজিয়ে ভিক্ষা করে আর গায়—

মনরে কলজ টীলা গিয়া
সোনার দেহ নষ্ট করলাম
বাঁশের মাচায় শোইয়া
মনরে কলজ টীলা গিয়া

নবদ্বীপ দাস মাখনের যজমান ফিরে এসে গল্প বলে। কইও না ঠাকুরবাই আগের দিন নিছে লরী ভইর‍্যা মানুষ। ফালায়া দিছে গণ্ডাছড়ার কেম্পে, পরদিন গিয়া দেখে, মানুষ নাই, খালি চাইর দিকদ্যা চুল পইড্যা রইছে। পাহাইড়্যারা জঙ্গলতে লাইম্যা হগ্যল মানুষ খাইয়া লাইছে।

এই সমস্ত কথা গ্রাম জুড়ে রটে। মানুষের কাজকর্ম নেই। দিনরাত শুধু ওই পাহাড়ঘেরা দেশ নিয়ে জল্পনা কল্পনা। মেয়েলোকেরা বিলের পাড়ে গান গায় করুণ সুরে—

যেই বনেতে পশু পাখী চইর‍্যা না খায় ঘাস
সেই বনেতে দিয়া আইলাম সীতা বনবাস।

বনবাসে যাবে কেন। পথ ঘাট চেনে না। মানুষজন জানে না। তবু প্রতিদিন মানুষ দেশ ছাড়ে। মাখন মনটাকে শক্ত করে। সব চলে গেলেও একা থাকবে। অচিন দেশে গিয়ে পথে ঘাটে মরার চেয়ে শত অভাব থাকলেও এই-দেশেই থাকবে।

বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। কোন পাখি-শিকারী ডুলা ভরে পাখি ধরে। আনতে আনতে ডুলার কোন ফাঁক দিয়ে সব পাখি উড়ে। তেমনি রসুলপুরের অবস্থা। মুখে বলে কেউ যাবে না। অথচ আস্তে আস্তে গ্রাম খালি হয়ে গেল। চারদিকে নিঃশব্দ এক হুড়াহুড়ি। কার আগে কে পালাবে। গরু, ছাগল, বাজারে বিকায় জলের দরে। কেউ বেচে খাট পালঙ।

কেউ বেচে নৌকা জাল। কেউ আবার নৌকা বেচলেও জাল বেচে না।

দলে দলে ভিড় জমায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মাইগ্রেশন অফিসে। ঘুষ দিয়ে কার্ড করে। কেউ আবার আখাউড়া সীমান্ত চৌকিতে দারোগাবাবুকে খুশী করার জন্য কেচি সিগারেট কিনে প্রস্তুতি নেয়।

যাদের বুদ্ধি আছে পয়সা আছে তাদের কথা আলাদা। গোপনে ছেলে পাঠিয়ে না হয় ভাই পাঠিয়ে সস্তা দরে জমি কিনে বাড়ী বানিয়ে সব পাকাপাকি করে। তারপর আস্তে ধীরে দেশ ছাড়ে। গেলেই হয় না। ত্রিপুরার কোথায় কোথায় গাঙ বিল আগেই খোঁজ নেয়। তার পরে পাড়ি। কেউ গেছে মেলাঘরে রুদিজলার পাড়ে, কেউ গেছে উদয়পুরে মহাদেব দীঘির পাড়ে। উদয়পুরে কাকড়াবনে ডাকমা জলা, হুরি জলার পাড়ে আত্মীয় কুটুম নিয়ে বস্তি বাঁধে কেউ।

কারো কারো ইচ্ছা দেশ ছাড়লে দেশের কিনারে থাকবে। যাতে ওই দেশে গিয়েও এই দেশের খবর মিলে। সীমান্ত বরাবর চারিপাড়া, গজারিয়া, জয়পুর, শানমুরা, লঙ্কামুড়া, কালিকাপুর গ্রামগুলোকে বেছে নেয়।

এই সমস্ত খবর রটে। লাগেনায়র যাবার হড়াহুড়ি। বাপ যাবে দেশ ছেড়ে শেষবার দেখে যাই। কেউ ভাবে মেয়ে জামাই দেশ ছাড়বে মেয়েটাকে একবার দেখে আসি। রজনী সর্দারের ছেলের বউ দাবী জানায়, যামুগা যখন জন্মের লাইগ্যা শেষবারের মতো মা বাপেরে দেইখ্যা আই। বেটামানুষ তোমরা যাইতে পারবা আইতে পাররা। আমরা গেলেতো আর আইতে পারতাম না। নদীয়া দাসের বউ যায় মেয়েকে দেখতে বরুনকান্দিতে। বলে, খাইমুগা যখন মাইয়্যাডারে শেষ দেখন দেইখ্যা যাই।

গ্রামের দেশের অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে ওঠে মাখন। কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। উড়ো উড়ো মন। কোথাও গিয়ে শান্তি মেলে না। রাত্রিবেলা মা ছেলেতে বসে যুক্তি করে। কোন সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পারে না।

যজমান বিপ্রচরণ দাসের দেওয়া ভিটেতে ছিল মাখন। সেই সম্পত্তি ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর করে লিখে দেওয়ার কথা ছিল। দলিল লিখে দেওয়া তো দূরের কথা গোপনে চান্দুরা বাজারের হাসান মিঞার কাছে বিক্রি করে দেশ থেকে পাড়ি দেয়।

হাসান মিঞা বড আডতদার। ইচ্ছে কবলে অনেক কিছু করতে পারে। রব ওঠে সামনের মাসে জোর করে উচ্ছেদ করবে। কিন্তু বাধা হলো ইসলামপুরের বস্থমিয়া। মাখনকে এসে বলে, ঠাকুরবাই, চিন্তা কইর্যনা। আমরা থাকতে এমন কোন বাপের পুত আছেনি তোমরাবে তুইল্যা দিতে পারে। হাসান মিঞা জাইত্যা বাই অইলেও ছাডতাম না। ইনসাল্লা আমরা বাইচ্যা থাকতে তোমরারে দেশ ছাইড়্যা যাইতে দিতাম না। আল্লা মামুদের দোয়ায় আমার বাড়ীতে কি লাডি কম আছে।

বস্থমিঞা বিরাট সম্পত্তির মালিক। প্রতিপত্তি প্রভাব কম না। যৌথ পরিবার। চল্লিশ পঞ্চাশ লোক একসঙ্গে খায়। লাঠিয়ালের সংখ্যাও কম না। ভরসা রাখে মাখন ঠাকুর। কিন্তু বিপদ হলো ভিটেমাটি থাকলেও থাকবে কেমন করে। শিষ্যসেবক যজমানরা প্রায় সবাই চলে গেছে। সমাজ বলে কিছু নেই। মানুষের যখন জন্ম, মৃত্যু বিবাহ বলে ব্যাপাব আছে, সমাজ ছাডা চলবে কি করে।

এইদিকে ত্রিপুরা থেকে মেসতুতো ভাই আবার লেখে, শিক্ষকতার কাজ ঠিক করে রেখেছে। সময় মত নির্দিষ্ট দিন তারিখে যেন পৌছে।

রাতে ঘুম আসে না। নতুন দেশ সম্পর্কে অজানা আশঙ্কা, অন্যদিকে আত্মীয়স্বজন, দেশমাটী ছেড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা। সবমিলিয়ে একটা উদ্বেগ ভরা রাত। পাড়া পরশীরা এসেছে বিদায় দিতে। চিড়া-মুড়ি পুটলায় বাঁধে। ভোরে পেটে কিছু দিতে চায়। কেন জানি মন মানে না। গরাব মানুষ আছে কি। নিবেই বা কি। থাল, কাথা, পাটাপোতা আর বাপেব রাখা পুরোহিত দর্পণ, নিত্য কর্ম পদ্ধতি বোচকায় বাঁবে।

পয়সা কড়ি বলতে বাঁশের চোঙায় মায়ের জমানো কিছু খুচরো পয়সা। সব মিলে পোনের ষোল টাকা হবে।

কাকা-কাকীদের প্রণাম করে। গ্রামবাসীরাও কাঁদে বিদায় দিতে। মাখনের মা দরজায় তিনবার ছুঁয়ে প্রণাম করে। ভিটে ঘাস-মাটীর বহু পুরুষের টান ছিন্ন করে যাওয়া। বুক ফাটে দুঃখে। ভিটের মাটীতে ছুঁয়ে কপালে ধুলো মেখে বলে, মাগো তুই থাক, আমি সায়রে ভাসলাম, দেখি কুলের লাগাল পাই কিনা। আডষ্ট গলায় কিছু বলতে পারে না। পায়ে

যেন কে আঁকড়ে ধরে। চিরদিনের চেনা দুর্বাঘাসের ডগাও বিমর্ষ। কিছু বলতে চায়। বোবা হয়ে থাকে বলে না। গাছগাছালির ডালপালা নড়ে না। দুঃখে স্থির। ঘর থেকে বেরোয়—বগলে বুড়ির পুটলা, হাতে লাঠি। পেছনে মাখন। যাকে পায় তাকে জড়িয়ে ধরে পথে পথে কাঁদে। মাথায় বোঝা। আরো ভারী। সঙ্গে গ্রামবাসীরা সাত গাঁও পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যায়। রাস্তার মোড়ে সোনাধন, আর সুমিত্রার মা। সুমিত্রার বিয়ের পর আসা যাওয়া, কথাবার্তা বন্ধ ছিল। মাখন বোঝা নামিয়ে দুজনের পা জড়িয়ে কাঁদে। তারাও কাঁদে। মাখনের মা সুমিত্রার মাকে জড়িয়ে জাপটে ধরে বলে, সুমিত্রার মা, মনে কোন দুখ রাইখ্য না, কত কষ্ট দিছি মনে।

যেতে যেতে বাঘজোড় বিলের উত্তর পাড় ধরে হাঁটে। বালি হাঁসেরা মুখ তুলে চায়। কোথাও কচুরীপানা নড়ে, সিংরা লতায় বাতাস দোলে। সবাই যেন বলতে চায় ঠাকুরবাই, আমরারে রাইখ্যা কই যাও। শৈশবের বিস্মৃত স্মৃতি যেন আজ একসাথে কথা কয়। মাখন আর বুড়ি জল ছুঁয়ে প্রণাম করে। পাশেই পসার চান ইস্কুলের ফাঁকে হারিয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত গ্রামবাসীরা বিলের পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছিন্নমূল দুটি মানুষ চোখ থেকে হারিয়ে গেলেও বিষণ্ণ হয়ে থাকে গ্রামবাসীদের মনে।

ডিষ্ট্রিক বোর্ডের রাস্তায় নামে। মির্জাপুরের পথ ধরে ধরে পাঁচসাও পৌছে। রাস্তায় অর্ধচন্দ্রের মতো পুল। এক মাইল দু মাইল গেলে বুড়ি হাঁপিয়ে বাঁকা কোমর সিধে করে দাঁড়ায়। দু চোখে খোঁজে নতুন দেশের ঠিকানা। যখন বুঝে আরো দূর, হাঁটুতে দুহাত ভর করে দাঁড়ায়। কখনো বসে জিরিয়ে নেয়। আবার ব্যথায় টনটন অচল পা দুটিতে জোর আনে। হাঁটে নতুন উদ্যমে। মনে মনে বলে, যাওয়া যখন লাগব রইয়্যা কি করুম।

পথের পাশে পাঁচ গাওঁয়ের বটগাছ। পাশে পুকুর নির্জন দুপুরে বড় বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়ানো। মা ছেলে বোঝা নামিয়ে বসে। পুটলার চিড়া চিবোয়। ঢকঢক পুকুরে গিয়ে জল খেয়ে মুখ মুছে আবার হাঁটে। বাপরে আর কত আটুম, হরসপুর আর কত দূর রইছে। মাখন মায়ের অবসন্ন অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। চল মা আর বেশীদূর আডন লাগতনা আয়া পড়ছে।

হরসপুরের পাশে লোহর নদী, কলকল করে বইছে। কোন দেশের জল কোন

দেশে যায় কে জানে। পাশে একটা ভাঙা দালান বাড়ী। লোকে বলে দেওয়ান বাড়ী। ওখানে নাকি মানুষ খেতো—দেওয়ান বাড়ীর লোকরা। নদী পার হয়ে যখন হরসপুর পৌছে বেলা তখন মাথার ওপর।

ইষ্টিশনে গিয়ে শাস্তাগঞ্জের টিকিট কাটে। মাখনের মা কোনদিন রেলগাড়ী দেখেনি। বিস্ময় ভরা চোখে দু হাত তুলে প্রণাম জানিয়ে গাড়ীতে ওঠে। দীর্ঘ সেই যন্ত্রদানবের পেটে কিলবিল করে মানুষ। তাদের মতো ছিন্নমূল কেউ হয়ত থাকতে পারে। ভাবতে ভাবতে বুড়ির কুলকিনারা মিলে না।

রেলের বাঁশী বাজে করুণ ধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে। বিরহী তিতাস, গাঙ বিল, মাঠ মানুষ, গাছালির বুক ফাটা কান্না যেন একসাথে রেলের বাঁশী হয়ে বাজে। দমক্ দমক্ ইঞ্জিন আওয়াজ করে ধূয়ার কুণ্ডলী আকাশে উড়ে। পেছনে বিচ্ছেদ ব্যথার বার্তা নিয়ে ধূয়া যেন উড়ে যায় ফেলে আসা গ্রামে দেশে। ছিন্নমূল মানুষের বিষণ্ণ নিশ্বাস নিয়ে দূর থেকে দূরে চলে যায়।

মাঠ, নদী, বিল, চেনা অচেনা মুখ সরে সরে দাঁড়ায়। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে মাটীটাকে জাপটে ধরে চুম্বন করতে। জিজ্ঞেস করতে চায়, মাটী যদি মা হয়, জন্মভূমি যদি স্বর্গের চেয়েও বড তাহলে কোন দোষে আমাকে ঘর ছাড়ালে! রেলগাড়ীর মন্থর ঝাঁকুনিতে বুড়ির চোখ জুড়িয়ে আসে। আবার ঘরের কথা মনে হতেই চমকে ওঠে ঘুম ভেঙে। বিশ্বের যত দুশ্চিন্তা চোখে জড়ো হয়ে ঘুম কেড়ে নেয়।

সন্ধ্যে সাতটায় সাস্তাগঞ্জে এসে পৌছে। প্লেট ফর্মে কাথা বিছিয়ে কম্বল কাটে। সারাদিন ক্লান্ত, একমুঠ চিড়া খেয়ে একলোটা জল ডগডগ গিলে লম্বা হতেই চোখ বুঝে আসে। চোখ বুঝেই বলে, বাবারে তোরে লইয়া সায়রে ভাসলাম, কই যামু, কই থাকুম ঠিকানা নাই। তোরে জন্ম দিয়া একদিনও শান্তি দিতাম পারলাম না। আমার জানি মরণ কেমনে হয়! ঠাকুর তুমি একটা গতি কইর। চিন্তা করিস না, ভিক্ষা কইরা খাইস, পরের ধনে লোভ করিস না।

মা যখন ঘুমে, মাখনের কানে তখন ইষ্টিশনের পাশ থেকে খোল-করতালের আওয়াজ ভেসে আসে। মাকে রেখেই মাখন গান শুনতে যায়। মহাজনের গদিঘরে কীর্তন চলছে। যেতে না যেতেই মাখনকে গজা নিমকি, মিষ্টি খেতে

দেয়। চিন পরিচয় নেই অথচ এত আদর, অবাক হয় মাখন। ক্ষুধার সময় অমৃতের মত লাগে সব।

হবিগঞ্জের সুর টেনে একজন বলে—

—বাবুরে, তোমার বাড়ী কোবায় ?

—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সাব-ডিভিশন।

—গান জানে ন নি ?

—হ থুরাথুরি জানি।

—ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার মানুষ অইলে গান না জাইন্যা পারে নি ! একটা গান গাওন লাগব কইলাম। আয়েন ভিতরে আইয়া একটা গান গাইন।

ইতস্ততঃ করে না মাখন। কেউ সাধাসাধি করবে তারপর গাইবে এমন নয়। পেট ভরে যখন খাইয়েছে অন্ততঃ গান গেয়ে তার ঋণ শোধতে হবে। কোন কথা নেই আসর পেয়ে গান ধরে মাখন।

কি কর বসিয়ে—মন দুরাচার
শ্রীচৈতন্য চিত্ত চিন্ত নাম।
এল দিন গেল দিন—
অঙ্গ অবশ হইলে লইতে
পারবে না রে ॥
শ্রীচৈতন্য হরি
উদয় নদীয়াপুরে
নিতাই এসে নাম বিলায় ঘরে ঘরে ॥

সধবা বিধবা সবার চোখে জল, মাখনের নিজের চোখেও। দেশের মাটিতে —এই বুঝি তার শেষ গান গাওয়া। শ্রোতারা মুগ্ধ। গদিতে মহাজন গদগদ। মাখনের হাতে পাঁচটাকা দক্ষিণা ধরিয়ে দেয়। খোঁজ খবর নিয়ে মাখনের মাকে প্লাটফর্ম থেকে তুলে আনে। বুড়ি পেট ভরে দৈ চিড়া খেয়ে ঘুমায়। যেন মরুভূমিতে জল পড়ে।

সকালে বাল্লার গাড়ী ছাড়ে। মহাজনের লোকেরা তাদের গাড়ীতে তুলে দেয়। সকাল বারটায় তারা বাল্লা ষ্টেশনে পৌছে। সামনে খোয়াই নদীর। ওপর গোদারা। খোয়াই শহরের নামই ছিল বাল্লা বাজার। বাজারে একজনকে

জিজ্ঞেস করে, আমরা রামচন্দ্রঘাট যামু মদনার চরে। নীলমোহন কববার বাড়ী। লোকটা দক্ষিণে সোজা রাস্তা দেখিয়ে দেয়। মাখনেরা পায়ে হাঁটার পথ ধরে চলতে থাকে। গনকি, জ্যাম্বুরা, মহাদেব টিলা সব বাঙ্গালী বাড়ী। অনেক আগে আসা লোকজন। তারপর সোনাতলা কালীবাড়া। কোণাকোনি খোয়াই নীলমোহন কববার খামার, সেখানে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে আসে। মায়ের পা নদী পার হয়ে ফোলা, শরীর চলে না, নদীতে কোমর জল। মাকে কোলে নিয়ে পার হয়।

মদনার চর থেকে পরদিন আবার যাত্রা শুরু সর্বংছড়ার দিকে। পরিচিত মাসী সর্বংছডার পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে যায়, মায়ের পা ফোলা তবু হাঁটে নীলমোহন কববার বাড়ীর পথে। বিরাট বিরাট টিনের ঘর, দূর্গা পূজার মণ্ডপ, হৃষ্টপুষ্ট চেহারার মানুষটি নীলমোহন। জীবনের প্রথম দেখা পাহাড়ী। নাক বোঁচা। ভাঙা বাংলায় কথা বলে। বুঝতে অসুবিধা হয় না মাখনের। এমন সুন্দর মানুষটির চেহারায় কোন হিংস্রতার ছাপ খুঁজে পায় না মাখন। এদের নিয়ে অনেক রসের গল্প শুনেছে, কিছুই বুঝে না সে, শুধু বিস্ময় ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে মাখন নীলমোহন কববার দিকে। লোকটার নির্মল হাসি দেখে মনে হয় মানুষ কত সরল আর পবিত্র। মাসী পরিচয় করিয়ে দেয়। নীল-মোহন নাতি বলে সম্বোধন করে তাকে।

এবার বনের পথ ধরে গৌরাঙ্গটিলা, সামনে ধলাইছড়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে পথ, দুদিকে ঘন বাঁশ বন পার হয়ে আলেপসা গ্রাম। কিছু আবাদী জমিজমা। মাঝখানে পায়ে-চলার পথ। লোকজন কাজ করে বেগুন আলুর ক্ষেতে। বাড়ীর বেড়ায় শাড়ী কাপড় ছড়ানো, তারপর গৌরাঙ্গটিলা। পাহাড়ী তালুকদার নব তালুকদার এই বিরাট হাওরের মালিক।

গৌরাঙ্গটিলা পার হয়ে কল্যাণপুর চা বাগান। শ্রমিকরা গাছের গোড়া সাফ করছে। পার হয়ে দ্বারিকা পুর। মণিপুরী গ্রাম, টিনের মন্দির মণ্ডপ। সুপারী গাছের চূড়া, মাঝে মধ্যে দু এক বাড়ী বাঙালী। সুবল মহাজন আর মধু মাষ্টারের বাড়ী, বিরাট মাঠ, কুঞ্জবন নামে এক গ্রাম। যেন সাজানো বাগান। পুবদিকে মুসলমান আর কিছু বারুজীবী, পশ্চিমে মুসলমান আর কিছু মণিপুরী বাড়ী।

মণিপুরী বাড়ী দিয়ে কোণাকোনি গিয়ে কয়েকটা শীল বাড়ী। পশ্চিমের কোণে বিপিন শীল, যোগেশ শীল, কুকিল শীল, ব্রজেন্দ্র শীলদের নতুন বাড়ী। মাখনেরা যোগেশ শীলের বাড়ী বিশ্রাম করে। বেলা প্রায় তিনটা বাজতে সর্বং-এর মাঠে পৌছায়। গোপালদেববর্মার বাড়ীর পাশে মাঠ, ধান নেই। হৃষ্টপুষ্ট মোটাসোটা ন্যাড়া। দেখেই বুঝা যায় উর্বর জমি। মনে আশার সঞ্চার হয়। আশ্বাস জাগে, বোঝে বাঁচা যাবে। চতুর্দিকে দেববর্মা বাড়ী। মাঝখান দিয়ে তির তির করে ছুটে চলছে সর্বাংছড়া পাহাড়ী বালিকার মত। -মা-ছেলে প্রণাম জানায়।

ছড়া পার হয়ে টিলা। রহিসিপাই পাড়া। সেখানে রাজারামের টংঘরে রাত কাটে তাদের। পিঠা খাওয়ায় রাজারাম, মাষ্টার তুমি আইছে আমরার সঙ্গে মিলিয়া থাকব। তোমারে বেজান আদর করব। তুমি চিন্তা কইর না। আলাংকা কলা কাঠাল খাইত পারব, তুমি খালি পুলাপান পড়াও, হরিণ খায়য়াইব, তুমি মুরগী খায়নি। খাইলে মুরগীও আনত পারে, বাঘের ডাক হুইন্যা ডরাইও না, আইরের সুটকী খাইত পারব, ছড়াত মাছ ধরতে পারব, মাস্তরী করব, বামনের কাজও করব, কিচ্ছু চিন্তা কইর না।

মাখন পরদিন সর্বং গোলটিলা ইস্কুলে যায়। সেখানে পুজোর আয়েজন চলছে। রঙ-বেরঙের পাছড়া পরা মেয়ে, মাথায় গেন্দা ফুল, খোপায় চুলের কাঁটা কানে ঝুমকা। যেন একদল প্রজাপতি ভিড় করে আছে। নেতা মুক্তা জমাদার, কালুদেববর্মা যদু দেববর্মা ব্যাণ্ড পার্টি নিয়ে আসে। পুজোয় ব্যাণ্ডপার্টি বাজানো সোজা কথা নয়। নতুন বাজনা শিখেছে তাই বাজানোর এত শখ। শ তিনেক লোকের সমারোহ, কি সুন্দর পরিবেশ! কে বলবে এরা মানুষ খায়! মেয়েদের কারুর বুকে টাকার মালা, গলায় ঝুলছে রঙ বেরঙের পুতি। স্বাস্থ্যবতী ফর্সা। কারুর হাত ভরে কাঁচের চুড়ি ফুলের কাজ করা রিসা। নীল ভ্রমরের নীলা লাগানো বক্ষ আবরণীর আঁচল, এত সুন্দর রুচি যাদের তাদের নামে কে বদনাম ছড়ায়।

সবাই ফুল আনে, কেউ চাল এনে স্তূপাকার করে। কলা, আম, কমলা জমে ঢিপির মত। কৌতূহলী চোখে নতুন ঠাকুরকে দেখে সবাই।—তুমি নি নতুন ঠাকুর! কেউ বলে তুমি নি নতুন মাস্তর। কেউ বা বলে আপনে থাক

আমরার গ্রামে, লেখা পড়া শিখত চায়। পোড়া পাড়ার দিকে আঙুল দেখিয়ে মুক্তা জমাদার বলে, মিলেটারী আইয়া গ্রাম পুড়াই দিছে, আমরা ইস্কুল খুলবার দাবী করছে বইল্যা। আমরাও ছাড়ছে না। মিলেটারীর লগে লাগছে, আরও লাগব। তোমারে লামের সঙ্গে দেখা করাইব। মাখন জিজ্ঞেস করে, লাম আবার কেডা।

মুক্তা জমাদার হাসি খুশী ছড়ানো মুখে বলে, আমররা কানা মানুষরে রাস্তা দেখাইবার মানু। হেই মানুর নাম লাম কয়। তুমি জানো নি! না জানলে আস্তে আস্তে জানব। বাঙলির মধ্যে কিছু খারাপ মানু আছে, তারার লগে তুমি মিশতে পারত না। আমরা দিয়া তুমি বাঁচতে পারব। আগে থাকি জানাই দিছে কিন্তু।

কে সেই লাম জানার জন্য মন আকুপাকু করে। জিজ্ঞেস করতেও সঙ্কোচ লাগে। পাছে অন্য কিছু ভাবে কিনা। মুক্তা জমাদার, পাড়ার সর্দার। প্রচণ্ড প্রতাপশালী। এলাকার ইস্কুল তার হাতেই গড়া। লামকে চেনেনা মাখন ঠাকুর। তবে বোঝে নিরক্ষতার জমাট অন্ধকারে লাম ঘুরে ঘুরে বাতি জ্বালে।

যদুরাম তখন চেষ্টা করে লামের পরিচয় জানাতে।—রাজা কইছে ইস্কুল দিত পারতনা। লাম কইছে ইস্কুল আমি করব। পারলে আটকাও। রাজা মেলেতারি পাঠাইছে। আগুন দিয়া মানু মারছে। লাম মাস্তর ঢুকায়া আরো আনে। তুমার মসা না মামকে জানে নিশি মাস্তর। নিশি মাস্তর পইলা আইছে এই ইস্কুল পড়াইত। নিশি মাস্তর পড়াইতে পড়াইতে বুড়া অয়া মরছে। লামে তারে কই থাকি আনছিল কইত পারত না। তুমও আমরারে নিজের মানু লাখান দেখব।

ডালা ভরে প্রসাদ জমানো। লাইনে ছেলে মেয়েদের দাঁড় করিয়ে মাখন ঠাকুর অঞ্জলি শুরু করে। মন্ত্রের উচ্চারণে গম্ভীর পরিবেশ। পবিত্র এক স্নিগ্ধতা চারদিকে ব্যপ্ত। উপনিষদের কোন পুণ্য সকালের মতো পাহাড়ে দিগ-দিগন্তে ছড়ায় এক নতুন আবহাওয়া। সর্দার, ছেলে বুড়ো সবাই বিস্ময় ভরা খুশীতে তাকায় ঠাকুরের দিকে। মন্ত্র শেষ হতেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সন্ধি দেববর্মা এসে বলে, তুমি মাস্তার অত মন্ত্র জানছে কেমনে। কম বেটা

না। বাপরে, গরীব অইলে কি অইব তুমি লেখাপড়া জানে। তোমারে মাস্তার বানাইব, দেশের বামুন বানায়া পূজাও করব।

নতুন দিগন্তের সূচনা হয় এখানে। কেউ টানে এদিকে, কেউ টানে ওদিকে। মুক্তা সর্দার বাঁশের হুঁকো টেনে মেয়েদেরকে ককবরকে বলে, যাও, তোমাদের মাষ্টারকে পিঠা খাওয়া।

মুক্তাজমাদার তাকে নিয়ে যায় নিজের বাড়ীতে। একটা আলাদা ঘর তুলে মা ছেলেকে থাকতে দেয়। ওরা নিজেরা থাকে মাচার ওপর ঘরে। বাঁশপাতার ছানি দেয়া ঘর। পাড়ায় পোনের বিশটা বাড়ী। সবাই মাখনের অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে অল্প দিনে।

উঠোনে গোলাভরা ধান। গোয়াল ঘর আছে। থাকলেও গরু বাঁধে না। ইচ্ছে মতো লতাপাতা খেয়ে বনে বনে চড়ে। প্রথম বাছুর জন্ম দিলে কয়দিন বেঁধে রাখে। দুধ দোহায় না। দুধ খেলে নাকি জ্বর হয়। দুধকে কেউ বলে গরুর পুঁজ। খেতে ঘিন্না করে। তবু গরু বাছুর কেন পালে যুক্তি বুদ্ধি মাথায় আসে না। মুক্তা সর্দার মাখনকে ডেকে বলে, মাষ্টর তুমি যত পারে দুধ খিরাও, আমরা দুধ খাই না। অভাব থাকলে গরু বেচতে পারে খালি। গোয়ালঘর বানাইছে বাঘে না খাইবার লাগি।

বাড়ীর চারদিকে আম, কাঁঠাল, আনারস, কলা ছড়াছড়ি। কেউ খায় না, কত খাবে। গাছে পাকতে পাকতে ঝরে পড়ে। গরু শুয়োরে খায়। বুনো সজারুরা আনারসের বাগানে ঘোরা ফেরা করে।

মুরগি, ছাগল, শুয়োরে গলগল করে বাড়ী। সবাই মহাসুখী। স্বাদে গন্ধে অন্যরকম খাওয়া এখানে খায়। আগুনিয়ার বৌ মাখনকে ডেকে বাড়ীতে বসায়। কলার পাতা ভরে আওয়ান বাঙ্গই খেতে দিয়ে বলে, খাও মাষ্টর, পিঠা তুমি কোনদিন খাইছ না। বিন্নি চাল সেদ্ধ করে হলুদ পাতার মতো বনের থরাই পাতা দিয়ে পুটলা বেঁধে আগুনে পুড়ে আওয়ান বাঙ্গই বানায়। সঙ্গে আবার গোদক। সহজ সরল রান্না। বাঁশের চোঙে সিদল, সিম, মরিচ ঢুকিয়ে আগুনে সেদ্ধ করে। আরেকটা বাঁশের টুকরা দিয়ে গুতিয়ে গুতিয়ে গোদক বানায়। তেল মশলার ব্যাপার নেই। কি অপূর্ব স্বাদ।—বাচই, আরেকটু দিবানি। মাখন চেয়ে নেয়। বাচই মানে বৌদি।

রাত্রে যখন শুতে যায়, প্রথম প্রথম ঘুম আসতো না। নিশুতি রাতে হরিণ ডাকে। কখনো বানর ডাকে দুঃখী মানুষের বুকফাটা কান্নার আওয়াজ দিয়ে। হঠাৎ রাত দুপুরে শোনে হৈ চৈ। চারদিকে খালি টিন পেটানোর আওয়াজ। মুক্তাসর্দারের মেয়ে রঙমালা ডেকে বলে, আতা তুমি দরজা খুলিস না, বাঘ আইছে। জানালা দিয়ে মাখন তাকিয়ে দেখে আগুনের মশাল হাতে, টাককাল হাতে, কেউ আবার টিন পিটে বাঘ তাড়ায়।

সন্ধ্যে হলেই পাড়া জুড়ে একটা কলরব ওঠে। রঙমালা প্রেমমালার গাইল সিয়া দিয়ে ধান কুটে। বিশ্বাচন্দ্রের বৌ তখন চকথী নামক চরকা চালিয়ে তূলার বীজ ছড়ায় তাদের টংঘরে।

চানছবি, পাড়ার মধ্যে সুন্দরী। যুবকরা এসে সারা বাড়ী জুড়ে গান বাজনা আসর পাতে। কেউ বারান্দায় টুং টাং শব্দে পাহাড়ী চমপ্রেঙ বাজায়। দেখতে অনেকটা গীটারের মতো যন্ত্র। কারো মুখে সুমুল বাজে। কেউ বাজায় দাংদু। ফু দিয়ে মেয়েদের বাজানোর বাজনা। চানছবি চাঁদের মতো মুখ তুলে ফিক ফিক হাসে। হাতে চলে দুং দুং আওয়াজে তূলা ধুনার ধনুক।

কসমৃতী কালো মেয়ে। বাপ ওয়াখিরাই যখন স্বরেশের বাড়ীতে বসে, ককবরকে মন শিক্ষার গান শোনে। কসমৃতী তখন লাঙ্গি মদের কলসে বাঁধা কলা পাতার ঢাকনা খুলে তিন চারজন যুবক যুবতী মিলে বাঁশের ছোট 'চুঙ্গই' নামক নল দিয়ে গলা ভরে লাঙ্গি টানে।

মুক্তাজমাদারের ঘরে পাণ্ডা জমার কোন কোনদিন। পাণ্ডা হলো মদের আসর। বয়স্ক বুড়োবুড়ী মিলে একসঙ্গে মদ খায়, দেশের হালচাল নিয়ে গল্প বলে। কেউ আবার বুড়ো বয়সে ঢোল বাজিয়ে নাচে।

কখনো শিকারে যাওয়ার বারুদ বানায়। প্রত্যেকের ঘরেই বন্দুক, ধনুক আছে। লোকে বলে গ্রামে গ্রামে লামের তৈরী বন্দুক কমিটি থাকে। মুক্তারাম সর্দার নাকি ওই রকম একটা বন্দুক কমিটির সভাপতি। লামের নির্দেশে গরীব মানুষের ওপর কেউ অত্যাচার করলে বন্দুক কমিটি গর্জে উঠতো। মাখন-লামকে নিয়ে ঘরে ঘরে গল্পে শোনে। তবে চোখে কোনদিন দেখে নি। শুধু এইটুকু জেনেছে অসহায় মানুষের বুকের বলের আরেক নাম লাম। কিছুদিন আগে নাকি লাম রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছিলো। এখন অবশ্য সেই যুদ্ধ বন্ধ।

তবু পুলিস মিলিটারী এসে মাঝে মধ্যে লামের দলের লোক খোঁজে। মাখন বারান্দায় মাটীর প্রদীপ জ্বালিয়ে ছাত্র পড়ায়। পড়াতে গিয়েও বাধা হলো আর্যার। যা বুঝাতে চায় ছাত্ররা বুঝে না। মুস্কিল হলো তারা যে বোঝে না খুলেও বলে না। মাখন বুঝলো এদের পড়াতে গেলে ভাষা শিখতে হবে। পাড়ার বন্ধু বৈশারায় তাকে ককবরক শেখায়। ছাত্রদের কাছেও শিখে। কোথায় যাও—বড় থাং, আমি ভাত খায়—আং মাই চাও। তোমার নাম কি—নিনি মুঙ তাম। প্রথম এই কয়টা বাক্য শিখেই ভুল ভাল বকে। কেউ তখন হাসে। মুক্তা জমাদার ঠাট্টা করে বলে, মাষ্টর, আমরা তিপরা মানু, বাঙলি কথা কইবার মতো, তুমিও ককবরক আথার পাথার কয়, কইতে কইতে তুমিও শিখব। বড় নিষ্ঠা আর অধ্যবসায় নিয়ে ককবরক শিখে ফেলে। ছাত্ররাও তখন ভিড় জমায়। যাদের অবস্থা ভালো, এক ভার করে বছর চুক্তি ধান দেয়। এক ভারে তিন মন ধান। যারা পারে না তারাও পড়ে বিনে পয়সায়। টাকা পয়সা না দিলেও কেউ জুম থেকে খাকুলু চীনার, মগদান এনে মাষ্টারের বাড়ীতে পৌছে দেয়।

লক্ষণ দেববর্মা আসে রূপরাই গ্রামের উঁচু পাহাড় থেকে। লোকে বলে অচাই। কারো অসুখ বিসুখ হলে মুরগী কেটে কাছিম কেটে মদ দিয়ে পুজো দেয়। কারো বাড়ী বিয়ে হোক, দিন তারিখ দেখতে গেলে তাকেই ডাকে। দশা, দিশা সবকিছু ঠিক করতে গেলে লক্ষণ আসে।

মাখন যখন রামচন্দ্রঘাট মাসীর বাড়ী বেড়াতে যায়, মার তখন গা কেঁপে ম্যালেরিয়া জ্বর আসে। রাত দুপুরে অচাইকে ডাকবে কে। বিশ্বাচন্দ্রের মেয়ে প্রেমমালা আর মুক্তার মেয়ে রঙমালা এসে বুড়ির সেবা যত্ন করে। নিজেদের জানামতো শেকড় বেটে রস খাওয়ায়। প্রেমমালার কথা একটু আলাদা। রঙ তার ফর্সা। ফর্সা বলাও ঠিক নয়, বলা যায় আগুনের রঙ গায়ে মাখা। চোখ ছোট তবু ওই চোখ দুটিতে সব সময় ফাঁদ পেতে রাখে। মাষ্টারকে আসতে যেতে তাকিয়ে থাকে অদ্ভুদ এক মমতায়। মাষ্টার যদি চোখ তোলে, অস্তাচল সূর্যের রঙে রাঙিয়ে ওঠে প্রেমমালার মুখ।

পাড়ার দক্ষিণে টীলার নিচে একটা কুয়ো। রাত দুপুরে কলস ভরে সেখান

থেকে জল আনে। মাখনের মার মাথা ধুয়ে দেয়। হাত পা টিপে আরাম দেওয়ার চেষ্টা করে।

জ্বরের ঘোরে বুড়ি তখন প্রলাপ বকে। প্রেমমালাম বুক ভয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠলেও বুড়ির কিনারা ছাড়ে নি। পরদিন মাখন আসে গুডরাই গ্রামের চন্দ্রধনকে সঙ্গে করে। সব শুনে কৃতজ্ঞতা ভরা চোখে প্রেমমালার দিকে তাকিয়ে বলে, কক্বরক ভাষায়, আমি না থাকার সময় মরণ কালে হাতে মায়ের মুখে তুমিই জল দিতে। বুড়ি মরেনি তুমি আছো বলেই। তোমার ঋণ শোধ করার শক্তি আমার নেই।

প্রেমমালা মাথা নুইয়ে বাঙালী বুড়ির মাথায় পাহাড়ী হাতের দরদমাখা আঙুল দিয়ে বিলি কাটে। চেহারায়, জীবন ধারণে, আচার অনুষ্ঠানে আলাদা আলাদা। তবু হৃদয়ের কোন এক জায়গায় কেউ কারো থেকে আলাদা নয়। এত দরদ সহানুভূতি দেখে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। নির্বাক হয়ে দাঁড়ায় মাখন।

পরদিন হঠাৎ ডাক পড়ে মাখনের। মুক্তারাম সর্দার গ্রামে বসে সিদ্ধান্ত করেছে এবার থেকে গ্রামের পুরোহিতের কাজ তাকেই করতে হবে। লাম নাকি খবর পাঠিয়েছে। তামার পাতের ব্রাহ্মণদের বাতিল করে নতুন ব্রাহ্মণ নিতে। আগে রাজার মনোনীত ব্রাহ্মণ ছাড়া শ্রাদ্ধ শান্তি হতো না। অচাই দিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি করলেও ব্রাহ্মণ না এলে শুদ্ধ হয় না। রাজার সনদ লেখা থাকতো তামার পাতে। ওই তামার পাতের ব্রাহ্মণদের কত কদর।

শ্রাদ্ধে আনতে গেলে হেঁটে যেতো না। তারাই যেন রাজা। পাছড়ার দোলন বানিয়ে ব্রাহ্মণ বসতো। দুজন পাহাড়ী গিয়ে দোলনা কাঁধে নিয়ে আসতো ব্রাহ্মণকে। সঙ্গে থাকতো শীল আর কর্তার জন্য শ্রাদ্ধ বাড়ীর সামগ্রী আনার লোক।

নিজেরা দুধ ঘি খায় না। কিন্তু তামার পাতের ব্রাহ্মণ গেলে ঘি, দুধ, মাছ, মাংস আগে থেকে যোগার করে না রাখলে বিপদ হতো। খোয়াই শহরে নিকুঞ্জ ঠাকুর, অমিয় ঠাকুর, তারাই ছিল তামার পাতের মালিক। ঠাকুরের রান্নার সাজসরঞ্জাম আলাদা। নিজেরা মশলা খায় না কিন্তু ঠাকুরের জন্য হলুদ, আদা, জিরা, মেথি, দারচিনি, লবঙ্গ, এলাচি আলাদা রাখা চাই ই।

শ্রাদ্ধে লেপ, তোষক, মশারি, দামী সুন্দী কাঠের খাট চাই। কাসার বড় বড় থাল থাকবেই। তার ওপর ভূমিদান গোদান করতে হবে।

এখনো রূপকথার মতো লোকে বলে, তামার পাতের ব্রাহ্মণ পাহাড়ী যজমানের ঘরে এসে দেখে দুধেল গাই। ঠাকুর তখন মন্ত্র পড়ার সময় নাকি বলতো, তিপরার মা স্বর্গে যায় ফির‍্যা ফির‍্যা চায়।

যজমান জিজ্ঞেস করতো, ঠাকুর কিতা অইছে।

ঠাকুর বলতো,এত মন্ত্র পড়লাম তোমার মা দেখি স্বর্গে যায় না। একটা বড় দুধের গাই না দিলে বুলে যাইত না।

—তে অত কয় কেনে, গাই চাইলে গাই দিব। কোন রকম উদ্ধার করতো পারেন নি।

এমন প্রতারণার অনেক ঘটনা পাহাড়ীদের মুখে ছড়ায়। কখনো যেতো গয়া কাশী, পাহাড়া যাত্রিকদের নিয়ে, পাচশো টাকা লাগলে বলতো দু হাজার লাগবে। তীর্থ থেকে ফিরে এসে ঠাকুররা দ্রোন দ্রোন জমি কিনতো।

গরীব কোন পাহাড়ী যদি শ্রাদ্ধ করে তাহলে ঠাকুরকে আনতে পারে না। পয়সা কড়ি নেই। কিন্তু ডালা ভরে চাল, ডাল, তেল, খাকুলু পৌছে দেওয়ার নিয়ম ছিল। তাহলে ঠাকুর বাঁশের চোঙায় শান্তিজল দিত। সেই জল ঘরে ছিটিয়ে শুদ্ধ হওয়ার নিয়ম ছিল।

মাখনকে পেয়ে সবাই খুশী। একটা আস্ত সুপারী, একটা পান দিয়ে। মাখনের কাছে গিয়ে শ্রাদ্ধ শান্তি দিন তারিখ জানতে চায়।

তিতাস পাড়ের মাখন ঠাকুর তখন আনন্দে আত্মহারা। সর্বং, গুংরাই, খেসরা বাড়ী, চেলা কাহাম, রূপরাই বাড়ী, সমস্ত পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটে পুজো পার্বণ করতে। কারো কাছে কোন দাবী নেই। যে যা দিতে পারে তাতেই খুশী। লাভ তার একটাই, যেতে যেতে গ্রামে গ্রামে বন্ধু বাড়ে। মানুষ চিনে। পাহাড় পর্বতের অন্ধকারে দিন রাত শুধু মানুষের ভালোবাসা কুড়ায়। এতেই তার আনন্দ। কোথাও পাতে ধর্মমায়ের সম্পর্ক। কোথাও পাতে ধর্মের মাপ।

পৌষ সংক্রান্তির মেলা জমে তীর্থমুখে। পাহাড় ডিঙিয়েমাখন যায় সেখানে।

শীতের রাতে ডম্বুর প্রপাতের জলে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে। পাঠা বলি, মুরগি বলি সব কিছুই হয়। মেলায় গিয়ে দেশ বিদেশের লোকেরা পরস্পরকে চিনে জানে। পাহাড়ীদের নিয়ম আছে মানত করে সেখানে গেলে নতুন অচেনাকে ধর্মের আত্মায় বানাতে হবে। নইলে আশাপূর্ণ হয় না। মা হারা ছেলে পথের চেনা মেয়েকে ডেকে প্রণাম করে ডম্বুরের জল ছুঁয়ে শপথ করে, আজ থেকে তুমি আমার মা। কেউ খোঁজে বানায় বাপ, কেউ খোঁজে বানায় দিদি। এই কারণেই তীর্থ-মুখের আরেক নাম মিলন মেলা।

মাখন যায় নিজে ব্রাহ্মণ হয়ে মনের মানুষ খুঁজতে। তিতাস পাড়ের শেকড ছেড়া ঠাকুর এই দেশে শেকড গাড়ে পাহাড়ে উপত্যকায়।

মাথার চামর তুলিয়ে ফুল ঝাড়ু বন থাকে পাহাড়ের ঢালু বুকে। চৈত্র মাসে শুকিয়ে তিল দানার মতো হয়। তার আগেই মাঘ ফাল্গুনে কাটার সময়। দল বেঁধে মেয়েরা যায় ভোরবেলা। পাহাড়ের গায়ে গায়ে দা দিয়ে কেটে মুঠি বাঁধে। কেউ মাথায় বোঝা করে আনে। কেউ পিঠের খাড়ায় ভরে নিয়ে আসে। রঙমালা, প্রেমমালা রোদে শুকায়। পুরুষরা সেগুলো সুন্দর করে বাঁশের বেতে বেঁধে বছরের জন্য ঘরের উপর রাখে।

মাঘ ফাল্গুনে মেয়েরা যায় বন সব্জী খুঁজতে। পাহাড়ের প্রকৃতির দান এমন। কেউ চাষ করতে হয় না। এমনিতেই লুঙ্গা জমিতে গানতুরুই নামক বনভুগী, কোথাও আবার বুনো লাইশাক ওরাই পাতায় বন ভরা। কেউ তখন বনের পাশে জলের ডোবায় "থরাই" তারা বনে ঢোকে। কারো ভালো লাগে জালি বেতের মতো পাতা লতা আনতে। চাখুই খেতে ভালো লাগে। চাখুই হলো বাঁশ পুড়ে ঘন বুননের বেতের ঝাকার ছাকা জল। সাথে সব্জী সেদ্ধ দেয়া সঙ্গে যদি পাহাড়ী ধইন্যা পাতা মুইচিং থাকে স্বাদ হয় অপূর্ব। রান কলার থোর আনতে যায় অমাবস্যা, পূর্ণিমায়। কলার গাছের ভিতরের নরম বুক যাকে বলে লাইফাং খায় কেউ। তামাসা করে কেউ তখন গান গায়, কেউ আবার খলো খলো হাসে। হাসি নয় পাহাড়ী ঝরনার কোন কলকলানি। মাখন ঠাকুরকে শ্রদ্ধা করে ভালোবাসে। "নখাই" নামক খাড়া থেকে মাখনের বারান্দায় দিয়ে যায়, মাষ্টর তুমি গোদক নাইলে চাখুই খাইয়ো।

গাছে গাছে তকছা লাংচাক পাখী ডাকে। ওই পাখীর গানে প্রেমের ভাষা বলে। যারা বোঝে তারা তন্ময়। যারা বোঝে না তারাও চমকে ওঠে। কিসের যেন একটা দোলা লাগে মনে। লোকে বলে ওই তকছা লাংচাকের ডাক শুনে পুরানো প্রেমের বিস্মৃত অতীত কথা কয়। বুড়ী জুমিয়া নারী হাতের টাককাল থামিয়ে আনমনা হয়। হারানো যৌবনের কোন প্রেমিক যেন দূরের পাহাড় থেকে ডাক ছাড়ে।

নির্জন দুপুরে পাতাহীন গাছ হরিণ শিঙের মতো। গাছ থেকে উড়তে উড়তে নীল আকাশে চিল যখন ডাক ছাড়ে মনে বড় আঘাত দেয়। সুখের যত পুরানো কথা ফিরে আসে মনে।

এমনতরো পাহাড়ে সুখী মানুষ দুঃখী হয় কেমন করে। মাখনের এক সঙ্গী নাম বৈশারায়। প্রথম প্রথম মাখনকে সে ককবরক ভাষা শেখায়। ককবরক ভাষা শেখার সুবাদে বন্ধু পাতে দুজনে।

পাড়ার লোক জমে "ইয়ার খামারি" (বন্ধুত্ব পাতানোর উৎসব) অনুষ্ঠানে। জল, পাথর, কাপাস লোহা ছুঁয়ে শপথ করে। একজন আরেকজনের বিপদে থাকবে মাথার চুল কাপাসের মতো সাদা হওয়ার পরেও। কেউ কারো সুদ খাবে না।

বৈশারায় দেখতে বেঁটে মোটাসোটা। খেরামবুক পোকার ডাকে বন-চ্ছায়ায় সন্ধ্যা যখন নামে, পাহাড়ী বৌরা তখন কেউ চিয়ক্ চিয়ক্ চিয়ক্ ডেকে মুরগি ঘরে তোলে। কেউ তখন পাহাড় থেকে লাকড়ী বোঝা পিঠের খাড়ায় উচু করে ক্লান্ত পায়ে নামে।

তখন বৈশারায় ছোটে। বাড়ী বাড়ী লাঙ্গি মদের নেশায়। তককী রায়ের বাড়ী না হয় খেরজু বুড়ার বাড়ী। লাঙ্গি বেচে তারা। লাঙ্গি আবার যেমন তেমন হলে চলে না। পৌষের খচাক ধানে চাল ভিজিয়ে তৈরী। সেটাই তার পছন্দ। কোনদিন দাম দেয়। কোনদিন দেয় না। নগদ দিতে না পারলেও তার কাছে লোকে লাঙ্গি বেচে। লাঙ্গির দাম শোধ করতে গিয়ে বৈশারায় পাঠায় বৌকে লাঙ্গি বেপারীর ঘরে কাজ করতে। ওর বৌ নখাতি রোজ স্বামীর সাথে ঝগড়া বাঁধায়। তবু লোকের কাছে ঋণ নিয়ে চলা ভালো লাগে না। বাধ্য হয়ে লাঙ্গির দাম দিতে গিয়ে পরের বাড়ী কাজ করে। কোন সময় জুম বাছাই

করে, কথনো জুমের কাপাস তুলে, কোন সময ডোবায় ভিজে ভিজে কিরিচ পাট ছাডায় ।

নিজে বড অলস। একদিন কাজ করলে তিন দিন বসে থাকে। ছেলে-মেয়েরা উপাসেই থাকে বেশী। এমনি সব সময় মাথা বেদনা, শরীব বেদনা বলে শুয়ে শুয়ে থাকে। আসল কথা রাতভর লাঙ্গি খেলে পরদিন নেশার চোটে বিছানা থেকে উঠতেই পারে না। জুম কাটতে গিয়ে আধা কাটে আধা কাটে না। চার পুডা ধান জুমে খুচিয়ে বোনার সময় তিন ভাগেব এক ভাগ খোঁচায়। তাই আবার বাছানির সময় এলে অর্ধেক জঙ্গলে থাকে। যা থাকে কাটতে গিয়ে অর্ধেক বন শূয়োরে খায়। কেবল বৌ এর কৃপায় কোনরকম কিছুটা তুলে আনতে পারে। জুমেব ফসল আধা পাকতেই মহাজন ঘরে ছোটে ঋণ আনতে। ফসল তার জুঁমে থাকতেই বিকায়। ঘবে এসে পা দিয়ে মাডাই কবে। তখন তা থে.ক লাঙ্গি বানানো শুরু হয়।

ধান কাটার মরসুমে বৌকে পাঠায় কাজে। নিজে খালি খায় আর ঘুমায়।

সারা বছর কাজ করে বৌ ভাবে পরনের "রিগনাই র্কিচক" ছেঁডা কাপড বদলাবে। কিন্তু মহাজনরা নাছোডবান্দা। গোপাল ঘোষ, বিনোদ গোসাই এরাই মহাজন। ফসল কাটার মরশুম এলে ঘোডা নিয়ে পাহাডে ঢোকে। কাপাস, ধান, তুলা, তিল সব কিছু ঋণ আদায়ের নামে নিয়ে আসে। ওদের ঘরেই খায় ঘুমায়, আবার ওদের সর্বস্ব কেডে নেয় ঋণেব ফাঁদ পেতে। অবস্থা আগে যেমন পরেও তেমন। বৌ তখন বলে, সারা বছর পরিশ্রম করে নতুন কাপড দূরে থাক একটা বেলা পেট ভরে খাওয়ার কপাল হলো না। বৈশারায় কাজে কর্মে বেশ তৎপর হয় তখন।

হলে কি হবে। গোপাল ঘোষ বড চতুর। কোন ফাঁকে জানি তার বাড়ীটাকে সাদা কাগজে লিখে নিয়ে গেছে। বাঁচার কোন উপায় নেই। গ্রাম ছেড়ে চলে গেলো আঠারমুড়ার গহন জঙ্গলে মুঙ্গিয়াবাডী পাডার কাছে। নতুন কোন পাহাড় আবাদ করতে।

পাহাড়ীদের জমি যেতে থাকে বাঙালী মহাজনদের ঘরে। ঘিলাতেলা, বাঘবেড পাডা, ওয়াতিরুং ঠিলায় আস্তে আস্তে পাহাড়ীরা কমে। নতুন করে

ওপার থেকে আসা মানুষের ভিড় জমে। বৈশারায়ের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা শুনে মাখন ভাবে কি বিচিত্র পৃথিবী।

মাকে এসে বলে, হুনছনি মা! বৈশারায় গ্রাম ছাইড়্যা গেছে গা। মহাজনরা এমন বেইমানি করত পারে বিশ্বাস করন যায় না। যে পাতে খায় হেই পাতে হাগে। গরীব বেচারার ভিটাটা বুলে কাগজ কইর‍্যা লইছে। দশ টেকার দাদন পাইত্যা এক মন পাট নিলে, হেরা বাঁচব কেমনে।

মাখনের মা—দেশেও ইতানের জালায় মরছি। ইখানো আয়াও হেরার স্বভাব যাইত না। তিপরারা যদি জাগা না দিত তাইলে খাইত কই। হের লাইগ্যা আওনের সময় পুজার দিন, রাজারামে কইছিল বাঙালির মধ্যে খারাপ মানুষ আছে, তারার লগে চইল্য না। বাবারে, বৈশারায়ের চোখের পানি এমনে যাইত না। সুদ খাওন্যা হগল বুঝব, যেদিন ঠাকুরে বিচার করব। এই রকম ধর্ম ডাকাতি কইর‍্যা কয়দিন চলব, ঠাকুরে ঠিকই দেখে।

মাখনের মন ভালো লাগে না। বৈশারায় অলস হলেও মানুষটা ছিল প্রাণবন্ত। মদ খেতো ঠিক তবুও মনটা ছিল বড়। মাখনকে ককবরক সেই শিখেয়েছিল। ভাষা জানার সুবাদ নিয়ে লোকের কাছে এত প্রিয় হতে পেরেছে একমাত্র বৈশারায়ের সাহায্যে।

ওই বৈশারায় এই গ্রাম ছেড়ে চলে গেছে। আঠার মুড়ার কোন জঙ্গলে গিয়ে বাঘ, ভালুকের সাথে দিনরাত থাকতে হবে। জানে না, জঙ্গল আবাদ করে কখন আবার কোন রকম জমি বেরোবে, জুমের ফসলে ঘর ভরবে। মহাজনরা সেখানে গিয়ে হাজির হবে। আবার এই অবস্থা হবে, তখন এরা যাবে কোথায়। জটলা বাঁধে হাজারো প্রশ্ন। বৈশারায়ের বৌ এক আদর্শ মহিলা। বেচারী এত হাড়ভাঙা খাটুনীর পর কোনদিন একবেলা পেট ভরে খেতে পারেনি। নিজে খেতে পায় না। তবুও যেদিন ওদের ঘরে মুরগি পুড়িয়ে ঝাল মরিচের মছুডেং বানাতো, পাতায় করে পাঠিয়ে দিতো মাষ্টারের কাছে।

দেশ হারানোর জ্বালা এখনো ধিক ধিক জ্বলছে মনের দিক দিগন্ত জুড়ে। একই যাতনা বৈশারায়ের মনে জুমের আগুন হয়ে কি জ্বলে না। ভিটে মাটি ছাড়ার দুঃখবোধ পাহাড়ী হোক বাঙালী হোক কারো বুকে শূন্য হাহাকার না উঠে পারে না।

কার্তিক মাস। বৃষ্টি একটু আধটু হয়। পুরানো জুমের মাটিতে ঘাস, নতুন লতা পাতা গজায়। তখন হরিণ শিকারে বেরোয় অনেকে।

মাখনকে ভালোবাসে বিন্তাবাগী। বনে বনে হরিণ, খাট্যা হরিণ, কালেশ্বর হরিণ, বুনো শুয়োর, বনছাগল শিকার করে দিন রাত ঘোরে। জুমচাষ করে না বললেই চলে। বৌটা কর্মঠ। কোনরকম জুম ক্ষেত সামলায়। ঘরের পুরুষ বিন্তাবাগী গাদা বন্দুক হাতে বনেই থাকে শিকার খোজে খোজে। শিকারে গেলে সঙ্গে একজন যোগানী লাগে। সবসময় কার এত অবসর যে কাজকর্ম ফেলে শিকার খুঁজে বেডাবে। একদিন সঙ্গে থাকে কেউ। শিকার না পেলে হতাশ হয়ে ফেরে। আরেকবার যেতে চায় না। নতুন কাউকে তখন খোঁজে। নতুন সঙ্গীও তুদিন গিয়ে আর যেতে চায় না।

কোন সঙ্গী না পেয়ে মাখনের কাছে এলো, মাষ্টর চলো না আমাব লগে শিকারে যাইত। লগে গেলে যেছা ভাবে অইলেও একটা না একটা হরিণ তো পাইব।

মাষ্টার বলে, কোনদিন গেছি না, কেমনে যাই কও ?

—আরে চলনা। আমি তো লগে আছে, তোমারে বন্দুক মারাও শিখাইব। গেলে বুঝ পাইব।

—পামু না পামু আন্দাজে গিয়া কি লাভ অইব।

—আরে কি কয় মাষ্টার, গত কাইল, জুমে হরিণ পায়ের পারা দেখিয়া আহ'ছে। আইজকে যেশা মতেই পাইয়া থাকবো।

মাখন গামছা গায়ে, জামা গায়ে দিয়ে হাতে একটা টাককল নিয়ে সঙ্গ ধরে। পাবারও লোভ আছে, তার চেয়েও শিকারের একটা দুঃসাহসিক অভিযানের ইচ্ছাও প্রবল। অভিজ্ঞতা না থাকলেও সহজেই রাজী হয়ে যায়। শুয়োর বেরোয় ভাদ্র মাসে। জুমে ধান, ধানের কচি করুল খেতে শুয়োর বেরোয়।

আবার মাঘ ফাল্গুনে জুমে ফসল থাকে না। লুঙ্গায় লুঙ্গায় কচুবনের খেতে নামে শুয়োর। এই মাঘ ফাল্গুন চৈত্রে বৈরা, আমলকী' এগুলা গোটা ধরে। হরিণরা জুটে গাছের নীচে নীচে। গোটার গন্ধ খুঁজে খুঁজে পাট পচানো পাহাড়ী ডোবায় শেওলা চাটতে বালেশ্বর হরিণ নামে। জলে জলে মুখ ডুবিয়ে শেওলা খায়।

সদ্য ফেলে আসা জুমের টংঘরের পাশে জুম ধানের তুষ জমে। তখনো বনমুর্গি, মথুরা পাখীরা ঝাঁক বেঁধে নামে। সবকিছু বিদ্যাবাগীর জানা ব্যাপার।

সূর্য যখন ডুবে ডুবে তখন হরিণ জঙ্গল থেকে বেরোয় ঘাস খেতে। নতুবা ভোরের দিকেও নামে। বেলা তিনটার মতো হবে। মাখন ছুটে বড় মুড়ার দিকে। রূপরাই গ্রাম পার হয়ে গভীর জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একটা বৈরা গাছ পেয়ে গেলো। নিজেই বৈরা গাছের নীচে সবুজ জঙ্গলের ডাল পালা কেটে ঝোপ বানায়। ঝোপের নীচে দু'জনে ঘাপটি মেরে বসে থাকে হরিণের অপেক্ষায়।

তখন কথা কর্ম, একেবারে চুপচাপ। কাশতে হলে মুখে কাপড় দিয়ে থাকে। গায়ে পোকামাকড় মশা বসলে থাপ্পর দিলে শব্দ হয় বলে হাত দিয়ে মুছে ফেলে। এমন করে দুদিন গেল। কিছুই পেল না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যা যখন হয় হয়, দেখতে দেখতে একটা হরিণ আসে। প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক দৃষ্টি। কান উৎকর্ণিত। পাতা বা কাঠ ঝরতেই মুখ তোলে। চার দিকে চায় অদ্ভুত মায়াবী দৃষ্টি মেলে। আবার বৈরা গোটা কুড়িয়ে চিবোতে চিবোতে একেবারে কাছে আসে।

আর যায় কোথায়। দড়াম করে একটা শব্দ হলো। লাগল কিনা কি জানি। এক লাফে হরিণটা লুঙ্গার দিকে ঝাপ দেয়। বেশ কিছু দূর গিয়ে জিভ বের করে মানুষের স্বরের মতো করুণ এক কান্নার স্বরে কাঁদে। মাখন আর বিদ্যাবাগী কাছে যেতেই মায়াবী চোখ দুটো স্থির করে মাথাটা লুটিয়ে পড়ে।

তখন একটা মায়া লাগে মাখনের। তবে ক্ষণিকের জন্য। দু পা জুড়ে বেঁধে মাঝখানে বাঁশ ঢুকিয়ে দুজনে বয়ে আনে গ্রামে। তখন কি আনন্দ। মাখন ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে হরিণ শিকরের কাহিনী বলে।

বিদ্যাবাগী কিছুটা মাংস কেটে মাখনকে দেয়। বাকীটার কয়েক টুকরা আত্মীয়-স্বজনদের বিলায়। বিরাট অংশটাই বেচতে নেয় বাজারে।

তখন বর্ষাকাল। ঝুকি উঠে যুবকদের। সবাই যাবে দল বেঁধে হরিণ শিকারে। বেশ কয়েকদিন হলো হরিণের মাংস পেটে পড়ে না। বাজারে জানান হয় তাদের, যাদেরকে গ্রামে পাওয়া যায়নি। বাজার থেকে সুরা

গন্ধক, ঘরের কাঠের আঙরা মিশিয়ে ভাজে কড়াইতে রাত্রিবেলা। তুলানন্দের ঘরে। সবে বসে গল্প করে লাঙ্গি টেনে টেনে। মাখনও যায় তাদের বাড়ী। বন্দুকের বারুদ তৈরী হয়।

পরদিন মোরগের ডাকে ঘুম থেকে ওঠে। মাখনের কেমন উত্তেজনা। অর্ধেক রাতেই ঘুম ভাঙে সকালের অপেক্ষায়। ঘনঘন বিড়ি টানে। তুলানন্দ ডেকে ডেকে সবাইকে জড়ো করে। পিঠে সবার মাইচু। সঙ্গে নুন মরিচ। হাতে বন্দুক, কারো হাতে তীর ধনুক। ত্রিশজনের দল ছোটে। তুলানন্দ বিদ্যাবাগী, বিশ্বকান্ত তারা অভিজ্ঞ। শিকারের গোলাবারুদ বানানো জানে। গাদাবন্দুকও বানাতে পারে। কোন জন্তুর কোন দিকে চলা, কিভাবে মারলে মরবে তাও বুঝে। কালেশ্বর, চামসিঙ্গাল হরিণ, পুরনো জুমের অড়হর ক্ষেতে আসে। পুরনো জুম হলেই হয় না। নিগূঢ় জঙ্গল হতে হবে।

পায়ের দাঁগ খুঁজে সন্ধানী চোখে। নির্দিষ্ট একটা পাহাড় বেছে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে খোঁজে। মাখনও পায়ের দাগ দেখেলে সেই পথ অনুসরণ করে। পায়ের নতুন দাগ বা পুরানো দাগ চেনাও কঠিন। দ্বিধা থাকলে সব জড়ো হয়ে পরীক্ষা করে। পায়ের দাগ ধরে যেতে যেতে মাঝখানে ছড়া। তখন দাগের দিশা থাকে না। ছড়ার পাড়ে খাড়া পাথরের টীলা। তখন যেতে যেতে বহু দূরে দূরে হরিণ আসা-যাওয়ার পথ বের করে। কোথাও মাটি সামান্য ধসে পড়ে, কোথাও পায়ের দাগ। মানুষ যাওয়া কোথাও খুব কঠিন।

দলপতিরা সে সব পথের চিহ্ন দেখে বুঝে। মাখন বিস্ময় ভরা চোখে তাকায়। কারো সাথে কারো যোগাযোগ নেই। পাহাড ঘিরে চারদিকে বেড় দিয়ে দাঁড়ায়। আঁকাবাঁকা ছড়ার মাঝেও দাঁড়িয়ে থাকে বিরাট এলাকা জুড়ে। দলপতিদের হাতে পেম্পু বাঁশী। বাঁশের গিট একটা রেখে অন্যদিকে তাককল দিয়ে ফাড়ে যাতে গিট কাটা না যায়। সেই পেম্পু বাশীতে ফুঁ দিলে অবিকল হরিণের মতো আওয়াজ। বন থেকে বনে বহু দূরে থেকে সুর শোনে বুঝে কোনদিকে হরিণের পায়ের দাগ আছে। হরিণরা শোনে মৈথুনের আহ্বান। কামাতুরা হরিণীর ডাকের মতো শোনায়।

হরিণ যখন দৌড়তে দৌড়তে আসে মরা বাঁশ ভাঙার আওয়াজ ওঠে।

প্রহরীরা তখন তীর ধনুক তাক করে নতুবা উচিয়ে বসে। সবাই নীরব। কাশির শব্দ পর্যন্ত নেই। যার কাছে যায় সেই শোনে। হরিণের পেছনে গুলি বা তীর লাগলে মরে না। সামনে, বুকে লাগলে পড়ে যায়। যদি ফসকে যায় আবার সেই দিকে বেড় দেয়।

হরিণ হয়রান হয়ে জিভ বের করে দাঁড়িয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে ব্যস্ত তখন গুলি করে মারে। শিকারীদের পেট চো চো করে। ফিরার ইচ্ছে ও আছে। কথা বলার শক্তি পর্যন্ত নেই।

হরিণ ধাওয়া নয়। এ যেন যুদ্ধে যাওয়া। কোন অসতর্ক মুহূর্তে বাঘ, ভালুক ঘাড়ের ওপর ঝাপ দিতে পারে। শিকারে গিয়ে নিজেই শিকার হয় কখনো। বিরাট খাড়া পাহাড়ের ওপর থেকে পা ফসকে গিয়ে কেউ অঘোর বনেই মরে। কেউ আবার পায়ে বিষাক্ত বুনো কাটা ঢুকে অচল হতে পারে। কখনো পাহাড়ের বিষাক্ত সাপের ছোবল খেয়ে নীল হয়ে পড়ে থাকে। শিকারীর দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে পাহাড়ী বৌদের বুক দুরু দুরু। মদ বানানোর পিঠা বানাতে বানাতে প্রিয়জনের স্মরণে যুদ্ধের গান গায়। যুদ্ধার বিরহী বৌ আজ শিকারীর বিরহী বৌ।

প্রেমমালা তখনো টংঘরের সাংসিতে বসে সূতা কাটতে কাটতে গান ধরে—

হাতুতুক্ কলম মাই-মুই পিং জ্যাগই
পাগড়ী পুহরালিয়া সবুজ পাগড়ী পুহরলিয়া
হাতুতুক কলক গুরমু পিং জ্যাগই
মাকরাই গুরুগলিয়া সবুও রাকুবাই গুরুগলিয়া,
তুই গেরেং গেরেং গাতি চাজ্যাগই
রিহিনই থনালিয়া যাদু রিহিনই থনালিয়া
গবতি হলংসা বাংমানি বাগই
রুকথারুই সালিপলিযা মবুদ রুকথারুই
সালাপলিয়া

উচু কাউন ধানের আড়ালে পাগড়ী
দেখার ইচ্ছে থেকে নজরে আসে না।
আকাশের দিকে তাকিয়ে যখন দেখি

বুনো মেহেদী বনে ঢাকা থাকে
তোমার চলা চরণ দুটি।
তোমার আওয়াজ শোনার
প্রতীক্ষায়, উতল হয়ে থাকি
পাশের ঝর ঝর ঝরণা
শুনতে আমায় দেয় না।
দৌড়ে যাই ধারালো নুড়ি
পা খুঁচিয়ে আটকে ধরে।
আবছা চোখে কুয়াশা মাখে
প্রিয় তোমার মুখ দেখা হয় না।

প্রেমমালা গান গাইলে কি হবে। মাখন তার কাছে মারীচের মতো মরীচিকা। প্রথম যেদিন সরস্বতী পুজোয় মন্ত্র শোনে সেদিন থেকেই এক ভোলা ভোলা ভাব। আলেয়ার মতো দেয় ধরা দেয় ধরা। তবু যেন দূরে থাকে।

মাখন বুঝে প্রেমমালার মনের গতি। বুকের ঘা এখনো দগদগ করে। কত দিন আগের সেই বাঘজোর বিলের কৈবর্ত বালিকা সুমিত্রার বুকভাঙ্গা কান্না মনে যেন বহুদেশ পার হয়ে এখনো বুকে বাজে। সেই ঘা শুকোতে না শুকোতে আরেকটা ঘা খাবার জন্য বুক পাততে কষ্ট লাগে। মেয়েরা শুধু ভুল করার জন্য জন্ম নেয়। প্রেমমালার প্রেমতরঙ্গে ডুব দিয়ে ঠাকুর যদি ডুবে মরে। কে আসবে তাকে টেনে তুলতেন।

ক্লান্ত শিকারীরা যখন বাড়ীর কথা ভেবে আনমনা হয় বউ-এর মুখটা আবছা হয়ে চোখে ভাসে। মাখনের চোখে ভাসে রিক্ত ব্যথার জ্বালা।

তখন কেউ প্রহরায় ঢিলে হলে সবাই এসে প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে যায়। বনে এসে বউ এর কথা ভাবতে গিয়ে হরিণটা ফসকে গেছে। এতদিনের হাজিরা তোমাকে দিতে হবে। অত যদি ইচ্ছা না থাকে তবে এলে কেন। মাখনকে কেউ কিছু বলে না, বিকেল হয়ে আসে একটি হরিণ পেতে। সন্ধ্যে বেলা পেলে করার কিছু থাকে না। হরিণ মারার পর ছড়ার পারে মাইচু খুলে খেতে বসে। হরিণ পেলেও আনন্দ থাকে না। ক্লান্তিতে অবসন্নতায়

দেহ আর চলে না। এতবড় হরিণ বহনের লোক থাকে না যে আনবে বিশমাইল উৎরাই চড়াই পার হয়ে।

কেটে কুটে একটা হরিণকে দশভাগ, পোনের ভাগ করে কাঁধে নেয়।

রাত গর্ভীর হয়। পথে শুকনো লাকড়ী জ্বালিয়ে পথ দেখে দেখে হাঁটে। বাড়ীতে পৌছতে পৌছতে ভোর হয়। কেউ ক্ষুধার চোটে বাড়ীতে এসেই এক ঘরে উঠে হরিণের পা পুড়ে খায় সবাই মিলে। সমান ভাবে বণ্টন হয়। তবে মাথাটা নেয় যে গুলি করে। পুর্বপুরুষের নিয়ম এটাই। কেউ বেচে কেউ খায়। কেউ শুকিয়ে চুলার উপর টাঙিয়ে রাখে। যাতে পোকায় না ধরে। মাখন ঘরে ফিরে মহানন্দে। তার অংশটা দুভাগ করে। একভাগ নিজে রাখে, বাকীটা পাঠায় প্রেমমালার ঘরে।

আশ্বিনের শেষ দিকেই শুরু। পাহাড় থেকে বাঁশ ছন কাটার আয়োজন। পাহাড় থেকে রুই, মিরতিঙ্গা মুলি চলু কেটে নামায় ছড়া দিয়ে। খোয়াই শহরে বা তেলিয়ামুড়ায় মহাজনরা ফরমায়েস দেয়। কেউ আবার বেত চিরে ঘরে বসে বড় বড় ঢোলের মতো ধান রাখার ঢোল বানায়। কেউ আবার সামনে গরম আসছে নেউলি বুনার জন্য তৈরী হয়। নেউলি মানে বাঁশের মসৃণ পিঠের বেতে তৈরী ধারি। ধারি বানিয়ে বাজারে বেচে। কেউ আবার বনকর বাবুর খাজনা দিতে না পেরে জেলে যায়। দা, কুড়াল কেড়ে নেয় কারো। মাখন যায় পাহাড়ে তাদের সঙ্গে। প্রথম প্রথম পাহাড়ে উঠতে ভয় করে। ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে পথ। বুটাং গাছের বন। কেউ আবার বুটাং কেটে কেটে শুকিয়ে বাজারে চালান করে। বুটাং গাছের বেড়া ঘরে দিলে অনেকদিন টিকে। ঘুনে সহজে ধরে না। বুটাং গাছের পাতা গায়ে লেগে কখনো জলুনি ধরে। তবু বনে যায় পেট পালতে। নইলে খাবে কী ?

বাঁশ চালান যায় কল্যাণপুরে। না হয় খোয়াই শহরের পাশে। মাইচু নিয়ে পাহাড়ে ওঠে। সারাদিন বাঁশ কাটে। কাটা বাঁশ উড়ে এসে পড়তে পারে। এক কোপে কাটা বাঁশে পা পড়লে অচল হতে হয়। অন্যমনস্ক হলে নিজের টাককল নিজের পায়েও পড়তে পারে। স্বর্ণমুনি পাহাড়ে গিয়ে হাত থেকে টাককল ছুটে পা কাটে। সঙ্গীরা তাকে কাঁধে করে বাড়ী এনেছিল। কত কাবিটাপ ঔষধ দিয়েও ভাল হয়নি। এখনো ঘরে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে।

অথচ বাড়ীতে রোজগার করার কেউ নেই। সপ্তাহ ধরে শুধু বাঁশ কাটে। কেউ মহাজন ঠিকেদার থেকে অগ্রিম নেয়। কেউ আবার নেয় না। একসাথে বাঁশ দিয়ে একবারে টাকা পায়।

বাঁশ জমিয়ে রেখে একদিনে নামায়। ত্রিশ চল্লিশ জন মিলে ছড়ায় কোথাও কোদাল নিয়ে বাঁন্দ দিয়ে জল ফুলিয়ে ভেলা বাঁধে। জল বাড়লে টানতে টানতে নৌকার গুণটানার মতো টেনে নামায়। যেদিন নামায় পরদিন রবিবার। কল্যাণপুরের বাজার। হাতে মুটা পয়সা আসে। যারা অগ্রিম নেয় তাদের দাম ফুরানো থাকে। যারা নেয় না, দর কষাকষি করে বাজার যাচাই করে। কেউ চাল, কেরোসিন, নিয়ে বাড়ী ফিরে বাঁশ বামলার দল। কেউ আবার মহাজনের ঋণ শোধ করে খালি হাতে বাডীতে আসে বিষন্ন মুখে।

কারো বাড়ীতে গোটা পরিবার অধীর অপেক্ষায় থাকে। উনুনে হাঁড়ি চড়াবে বলে। যাদের আছে তাদের কথা আলাদা। যাদের নেই বিপদ তাদের। সবদিন মহাজনের কাছ থেকে টাকা পায় না। সেদিন বাডীর অবস্থা বড় করুণ। বাঁশ কামলা বড় বিমর্ষ হয়ে ঘরে যায় ধীরে ধীরে। বাড়ীতে এলে শুকনো উপাসী মুখের সামনে দাঁড়ায়। পরিশ্রমে ক্লান্ত দেহটার পেটে কিছু পড়ে না। না খেয়েই ঘুমায়। বাডীতে অশান্তির আগুন জ্বলে। চন্দ্রবদন এমনি এক বাঁশ কামলা। বাজারে মিরতিঙ্গা বাঁশ দিয়েছিলো। তেলিয়ামুড়ার সারদা বাবুর কাছে। সারদা বাবুর কর্মচারী বাঁশ নামলে নেয় কিন্তু পয়সা দেয় না। সারদা বাবুর অপেক্ষা করতে করতে রাত অনেক হয়। সঙ্গীরাও সবাই সওদা ছেড়ে বাড়ী ফিরে। চন্দ্রবদনও ফিরে অনেক রাতে শূন্য চালের থলি নিয়ে।

আসতেই বউ ঝগডা বাঁধায়। চাল যদি আনতে না পারে আগে কেন খবর দিলে না। ধার করে ছেলেগুলোকে খাওয়াতাম। কথা থেকে কথা বাড়ে। রাগের চোটে জোরে থাপ্পর মারে বউকে। বউ এখনো কালা হয়ে আছে। আবার যেদিন বেশী পায় বৌকে বলে লাঙ্গি নিয়ে আয়। কিছু পয়সা হাতে থাকলে যন্ত্রণা বাড়ে। খরচ করে নিঃশেষ করতে না পারা পর্যন্ত এক দারুন অশান্তি।

পৌষের সংক্রান্তি শেষ। পরদিন প্রেমমালা কলাপাতায় বেঁধে বিরনচালের আওয়ান পিঠা নিয়ে এলো মাখন ঠাকুরের ঘরে। মাখন তার বুড়ি মাকে নিয়ে উঠোনে কোণায় গাইল সিয়া দিয়ে ধান কুটে। বাড়ীঘরে যখন বউ নেই। কি করবে নিজেই ধান কুটে। প্রেমমালার বড় কষ্ট। মাখনের ঘামে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে বলে, আতা, অত কষ্ট করছ কেন। আমাকে বললে কি দু তিন পোড়া ধান কুটে দিতে পারি না।

মাখন ঠাকুরও জবাব দেয়, প্রেমমালা কথা ঠিক, একদিন না হয় তুমি এসে ধান কুটে দিয়ে যাবে। সারাজীবন কে আসবে আমার ধান কুটতে !

প্রেমমালা বুঝে কথার গভীরে কিসের যেন ইঙ্গিত। আওয়ান পিটার মচা বারান্দায় রেখে মাখনের কাছে যায়। মাখনের সিয়াটা কেড়ে নিতে চাইলে মাখনের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয় কিছুটা। কেমন একটা মাখামাখির মতো ব্যাপার। মাখন শেষ পর্যন্ত না বলতে পারে না। এক সকাল কাজ করে প্রেমমালা। মাখন তখন বসে বসে তাকিয়ে দেখে। প্রেমমালা হুঁস হুঁস মুখে আওয়াজ দিয়ে সিয়া মারতে থাকে। সিয়ার তালে তালে বুকের রিসা শিথিল হয়ে আসে কখনো। সিয়া থামিয়ে রিসা বাঁধতে বাঁধতে মাখনের দিকে লাজুক চোখে চায়। আগুন রাঙা ঠোটের কোণায় লুকোচুরি খেলে এক হাসি। হাতে চুড়ি ঝমর ঝমর বাজে। কখনো খোপার চুল খুলে উড়ে গিয়ে কপালে লতা হয়ে আল্পনা আঁকে। ওই রূপে তখন প্রেমমালাকে কত সুন্দর দেখায়। মাখনের চোখে ধান্দা লাগে রূপের ঝলকানিতে। না বলা মনের কথা মনের মাঝেই দালিয়ে বাকিয়ে ওঠে।

আবার দেখতে দেখতে গম্ভীর হয় মাখনের মুখ। এক সরল পাহাড়ী মেয়ে ভালোবাসতে গিয়ে কোন কাঁটা বিছানো পথ ধরবে। বলা যায় না, কিসের মধু সংকেত বয়ে আনছে এই শীতঝরা পৌষেব সকালে। নাকি সর্বনাশের কোন আভাষ।

প্রেমমালা ধান ঝাড়ে কোমর দোলে দোলে ডালা নাচে। নাচন যেন চলে মাখনের হৃদয়ে তাল ঠুকে ঠুকে। কাজ শেষ। তুষ কুড়া বাতাসে

উড়িয়ে প্রেমমালার চুলে মাথায় ভরে। অনাগত ভবিষ্যতের কোন এক ব্যস্ত ঘরণীর কোমল ছবি মনের পটে স্থির হয়ে দাঁড়ায়।

প্রেমমালা চলে গেল। ফর্সা পায়ে ঝরণায় নামতে যাওয়া কোন এক বনপরীর মতো মূর্চ্ছনা তুলে। মাখন বিভোর হয়ে চেয়ে রয়।

মাখনের বড সখ জুম চাষ করবে। জমিজমাও যখন নেই জুম ছাড়া উপায় কি। ছাত্র পড়িয়ে কদিন চলবে। পেটের খোরাক হলেও আনাজ সবজীর জন্য কতদিন পরের ওপর নির্ভর করবে। গুংরাই বাড়ীর মধুমঙ্গল জুমের যত বীজ ধান সে দেবে। মুক্তারাম সর্দার বলেছে এক তুটা কুলাঙ কিনে জুম কাটতে সাহায্য করবে। তবু দ্বিধা পারবে কি পারবে না।

কুলাচ মানে শ্রম বিনিময় প্রথা। দল বেঁধে শ্রম বিনিময় চলে। চন্দ্রধনের কুচে সবাই একদিন কাটবে, চন্দ্রধনও যাবে রাজারামের জুমে। যাদের জুম নেই, অথচ প্রাপ্য মিলিত শ্রমটা বেরবে অন্যের কাজে। তাকেই বলে কুলাঙ বেচা।

দিন তারিখ ঠিক করে জুম কাটতে চলে ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে। মাখনের সঙ্গে জনা বিশেক যুবক। ভোর থেকে মচা ভাত পিঠের খাবার ভরে জুমিয়ারা পশ্চিম রূপরাই গ্রাম পার হয়ে আরো ভেতরে বড় মুড়া গহন বনে। জঙ্গল যতো পুরানো জুম ততো ভালো হয়। গায়ে তাদের কাটা কাপাসের জামা জুতাই। হাতে টাককল।

পাশেই জঙ্গল চিহ্নিত করা সিজন পাহাড়ের চূড়ায় ওঠে কর্ম কলরব। বাঁশ কাটে, গাছ কাটে। পাহাড়ে শোইয়ে রাখে কাটা জঙ্গল। শুকিয়ে পাতা খর খর হলে তখন আগুন দেবে। ঠক্ ঠাক্ ঠক্ ঠাক্ আওয়াজে দুর্গম জঙ্গল চোখের নিমেষে মাথা নুইয়ে ঢালুতে পড়ে। কেউ ক্লান্তির মধ্যে গান ধরে। কেউ আবার রূপকথার গল্প বলে। কাটা বাঁশ গাছ উড়ে উড়ে পাহাড়ের নেতিয়ে পড়ে। টাককল চলার ঠকাঠক ছন্দে মাখনের মনে জাগে নতুন জীবনের অচেনা শিহরণ।

মাখনকে নিয়ে জুমিয়া যুবক একাকা যায় নীচে। ছড়ার জলে চিংড়ি আর কাকড়া ধরতে। ছড়ার গর্তে পাথরের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে লাটি, চিংরি, ধরে। সবাই যখন ব্যস্ত তখন বাঁশের চোঙে গোদক বানায়। প্রথম পর্বের

কাজ শেষ করে গাছের নীচে বসে মচাভাত খুলে। মাখন তখন গোদক বিলায়। কেউ খেয়ে বাঁশের হুঁকোতে তামাক টানে। কেউ আবার এক সঙ্গে বড় একটা পাথরে ঘষে ঘষে টাককাল শান দেয়। দুপুরে চিলের ঝাক বা বনের ঝিঝি সংসার একটানা ডাক শোনে বুঝে দুপুর সময় কত।

সন্ধ্যে বেলায় রং সারুই পতঙ্গের ক্রিং ক্রিং ক্রিং আওয়াজে বন মুখর। তখন ছুটির ঘোষণা। জুমিয়ারা ঘর ফেরে দল বেঁধে। আসার সময় কেউ আনে কলা পাতা, কেউ আনে বনের আনাজ সবজি।

মেয়েরা ঘরে থাকে ব্যাকুল অপেক্ষায়। চিরুনি দিয়ে চুল আচরানো নিষেধ। কাঁটা ফুটতে পারে পায়ে। তূলাধোনা নিষেধ। তূলার মতো উড়ে গিয়ে বনের বাঁশ জুমিয়ার বুকে যদি বিঁধে যায়।

প্রেমমালার মনটা কাঁপে থরো থরো। নতুন জুমিয়ার বিপদ আশংকার দুর্ভাবনায়। এরই মধ্যে সন্ধ্যে হওয়ায় গান ধরে উদাসী সুরে। সামনে জুমে যাবে জুমের ধান খুঁজতে। না হয় জুমে বাছানর কাজে জোড়া জোড়া যুবক-যুবতী জুম পুড়তে প্রেমের গান গাইবে। বিরহের সুরে বন কাঁদাবে। নতুবা হৃদয় ভাঙ্গা ব্যথায় ছল ছল চোখে শুনে দূরে যে প্রেমিক অন্য প্রেমিকার পাশে বনা নম্র তাকে দেখে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

প্রেমমালার স্বপ্নে বিভোর তবু সংশয়ে ভরে মনে গান ধরে আপন মনে—

অ মনাই নন হাম জাকতুই
অ মনাই নন হাম জাকতুই
বুইন্য হামজাকয়া।
নন হামজাকমা বালা
নন সুইফুরু
আন সুইয়ানি কাইতুছা
বর্ধি লাংতুন।
অ মনাই মহাভারত পড়ি মানঅ
কপাল লে পড়ি মানইয়া
নন সুইমানি রাং চাকনি কলম
আনঅ সুইমানি ওয়াফি।

ওরে মনা তোমায় ভালোবাসি

ওরে মনা তোমায় ভালোবাসি

অন্য কেউ আমায় চিনে না।

তোমার কপাল লিখতে গিয়ে

বিধি কেন আমার নামটা লিখল।

সেই নিঠুর বিধি কেন মরে না।

ওরে মনা মহাভারত পড়তে পারি

কপাল কেন পারিনা।

তোমার কপাল লেখা

সোনার কলম দিয়ে,

আমার কপাল লেখা

বাঁশের কাঠি দিয়ে।

বাঁশ ঝাড়ে, আমলকী বনে, রঙ্গী, রাতা গাছের পাহাড় পার হয়ে আসে জুম থেকে ফিরে আসা ক্লান্ত অবসন্ন মাখনের কানে। মনে হয় তিতাস পাড়ের বহু বছর আগে হারানো মানিক নতুন পাছরা পড়ে তারই পথ চেয়ে ব্যাকুল হয়ে রয়েছে।